জাতি গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক

আলমগীর হোসেন খান

জাতি গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক

আলমগীর হোসেন খান

গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবঃ

www.pathagar.com

জাতি গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক

প্রথম সংস্করণ ❑ সেপ্টেম্বর ২০০৭
প্রকাশক ❑ আবু তাহের সরকার
গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড
গেন্ডারিয়া ঢাকা-১২০৪
ফোন ৭৪১৩৬৭৪

স্বত্ব ❑ লেখক

বর্ণ বিন্যাস ❑ জামাল অহিদ
বি. পি. কম্পিউটার্স
মুদ্রণ ❑ গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড
গেন্ডারিয়া ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪১৩৬৭৪
প্রচ্ছদ ❑ কবির
মূল্য ❑ ১২০ টাকা
একমাত্র পরিবেশক ❑ হাতেখড়ি
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭৫১৮১

ZATI GOTHONA SUSHAKHY SHIKHOK by ALAMGIR HOSSAIN KHAN. Published by Abu Taher Sarker. Printed by Gawchhia Press & Publications, Dhaka-1204. First Publication : September 2007. Cover Designed by Kabir. Price : Tk. 120 Only. US $ 3.

ISBN 984-8593-20-9

www.pathagar.com

উ|ৎ|স|র্গ

রাফিউল হাসান (রাফি)
আমার ছোট ছেলে। তার চোখে কী প্রগাঢ় মমতা!
বাবা! তোমার চোখের এই মমতা চিরস্থায়ী হোক,
পরমকরুণাময়ের নিকট এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

আমার অনুজপ্রতিম আলমগীর হোসেন খানের বেশ কিছু লেখা আমি পড়েছি। শিশু কিশোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলোতে ভাষা সহজ-সরল এবং বিষয় গ্রন্থনা চমৎকার। সম্প্রতি তাঁর লেখা জাতিগঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক পাণ্ডুলিপিটি আমি পড়েছি। পেশায় শিক্ষক হওয়ার কারণেই হয়তো তাঁর লেখায় নিষ্ঠাবান গবেষকের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। আমার মনে হয় বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মরত সবাই এই বইটি দ্বারা উপকৃত হবেন।

প্রফেসর কাজী জাকের হোসেন
সাবেক ডীন
জীববিদ্যা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ আগস্ট, ২০০৪ইং

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

জাতি গঠনে শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর। প্রকৃত শিক্ষক সুশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মধ্যে তিনি নিয়োজিত নন; বরং তাঁর প্রতি পদক্ষেপ এবং জীবনাচারে বিম্বিত হয় সুশিক্ষার আলোকমালা। সে আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয় এবং জীবন গঠনে আত্মপ্রত্যয়ী হয় তাঁরই শিক্ষার্থীবৃন্দ। অধিকন্তু বলা যায়, শুধু ছাত্র বলয়ে তাঁর আদর্শ সীমিত না থেকে তাতে অনুপ্রাণিত হয় অপরাপর শ্রেণির মনুষ্য জাতিও। যদিও শিক্ষকের আদর্শ সুশিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়, তথাপি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝেই সর্বোপরি সুশিক্ষার আধার সৃষ্টি করতে হবে। দেশের ভবিষ্যত কাণ্ডারিদের গড়ে তোলার সুমহান ব্রতে যাঁরা নিয়োজিত সেই সুশিক্ষায় শিক্ষকের প্রয়োজন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। পেশার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রেখে জাতি গঠনের লক্ষ্যে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারলেই সুশিক্ষায় শিক্ষক তাঁর ব্রতে নিবেদিত আছেন তাই প্রকাশ পাবে। শিক্ষকতায় নিবেদিত আলমগীর হোসেন খান এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাঁকে আমার অফুরন্ত সাধুবাদ জানাই এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মোঃ আজিজুল হক
জেলা শিক্ষা অফিসার
নারায়ণগঞ্জ

১২ আগস্ট, ২০০৪ইং

www.pathagar.com

প্র|বে|শ|ক

যেকোন জাতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা শিক্ষার ব্যবস্থা জাতির দর্পণ। শিক্ষা ব্যবস্থা যতো উন্নত হবে জাতি ততো উপকৃত হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব একটা কম নেই। দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সাথে জড়িত এবং শিক্ষকতা পেশায়ও নিয়োজিত আছি বলেই এই ধরনের একটি গ্রন্থ লেখায় হাত দেই। এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা অনুষদের সাবেক ডীন ও প্রখ্যাত লেখক প্রফেসর কাজী জাকের হোসেন যে মুখবন্ধ দিয়েছেন তার জন্য শ্রদ্ধাভাজন স্যারের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। নারায়ণগঞ্জের জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব আজিজুল হকও একটি বাণী দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বইটি রচনার ক্ষেত্রে যেসব লেখকের পুস্তকাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে আত্মস্থ করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এর স্বত্বাধিকারী জনাব আবু তাহের সরকার।

এই গ্রন্থের বর্ণবিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন জামাল এবং অহিদ ভাই। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমার জীবন সঙ্গী ফৌজিয়া ইয়াসমিন, আমার বড় ছেলে মাহমুদুল হাসান রাকিবের কথা উল্লেখ করতে হয় যারা এ গ্রন্থের জন্য আমার ব্যস্ততাকে সানন্দে মেনে নিয়েছে।

বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও বইটির মধ্যে অনেক ভুলত্রুটি হয়তো রয়ে গেছে। সুধীজনের পরামর্শ এবং সহৃদয় সহযোগিতায় পরবর্তী প্রকাশনে ত্রুটি মোচনের আশা রাখি। গ্রন্থটি পড়ে পাঠক উপকৃত হলেই আমার শ্রমও সার্থক হবে।

আলমগীর হোসেন খান
৭৮/১ ফুল কুটির
আলীগঞ্জ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ইং

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	জাতি গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক	৯
২.	একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৪
৩.	শিক্ষার অর্থ, সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	২১
৪.	শিক্ষার বিভিন্ন মতবাদ	২৯
৫.	বিভিন্ন যুগে শিক্ষাব্যবস্থা	৪০
৬.	মাধ্যমিক শিক্ষায় গণিতের সমস্যা ও তার সমাধান	৫২
৭.	পরীক্ষায় নকল ও তার প্রতিকার	৫৫
৮.	বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকের কর্মজীবন ও দৈন্যদশা	৫৯
৯.	জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	৬২
১০.	বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সংকট ও সমাধান	৭০
১১.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা	৭৮
১২.	উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমল	৮৩
১৩.	বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও বর্তমান কাঠামো	১০৭
১৪.	শিক্ষা কমিশনের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৮২-২০০৪)	১১৩
১৫.	মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান	১৩৩
১৬.	মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়	১৩৭
১৭.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা এবং শ্রেণী শিক্ষকের দায়িত্ব	১৪২
১৮.	মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রশাসন এবং পরিচালনার মূলনীতি	১৪৬
১৯.	মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো	১৪৯
২০.	মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের কাঠামো	১৫৪
২১.	বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন	১৫৫
২২.	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১৫৮

www.pathagar.com

জাতি গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক

শিক্ষকরা জাতির বিবেক, মানুষ গড়ার কারিগর। কোন কিছু গড়তে হলে, সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন দক্ষ ও বিবেকবান কারিগরের। এদেরই অবদানে বিদ্যমান পৃথিবীর সকল অমর সৃষ্টি। পার্সিডেল রেন বলেছেন, "শিক্ষক শুধু খবরের উৎস বা ভাণ্ডার নন, কিংবা প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার তথ্যসংগ্রহকারী নন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও যোগ্য উপদেষ্টা; একজন সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, শিশু মনের বিকাশ সাধনের সহায়ক তথা তাদের চরিত্র গঠনের নিয়ামক।"

শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের দর্পণ। শিক্ষা ব্যবস্থা যত উন্নত হবে সভ্যতা তত বিকশিত হবে। শিক্ষা বহতা নদীর মতো সে যেমন সভ্যতাকে ধারণ করে তেমনি লালনও বহন করে।

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান "আদর্শ জাতিগঠনে শিক্ষকের ভূমিকা" প্রবন্ধে লিখেছেন, "শিক্ষককে হতে হবে দীক্ষায় ও দর্শনে, কথায় ও কর্মে এক। বচনে ও আচরণে যে এক নয় সে শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নয়।"

শিক্ষার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি। জাতির এই ভবিষৎ ভিত্তি গঠনে দক্ষ শিক্ষকের বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র।"

দক্ষ জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিক্ষকগণ। প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী "শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষাঙ্গন" প্রবন্ধে লিখেছেন, "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষার মেরুদণ্ড শিক্ষক। মেরুদণ্ড যদি সবল না হয় তাহলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া দুর্বল হতে বাধ্য।"

প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকই যদি প্রকৃত অর্থে শিক্ষক না হন, তাহলে কে গড়বে মানুষ। মহানবী (স:) নিজেকে দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, সেনানায়ক ধরনের কোন অভিধায় প্রকাশ করেননি। তিনি বলেছেন, "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

ছাত্র সমাজের মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে শিক্ষক। শিক্ষকের মেধা অধ্যবসায় এবং অবিরাম শ্রমের ফসল হচ্ছে আগামী দিনের সুশিক্ষিত জাতি গঠনের পূর্বশর্ত।

শিক্ষা জাতিকে মুক্তির পথ দেখায়। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। যদি সে শিক্ষা হয় প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত দক্ষ এবং যোগ্য শিক্ষকের। প্রফেসর মোহাম্মদ আনসার আলী 'শিক্ষানীতি' গ্রন্থে

www.pathagar.com

শিক্ষকের গুণাবলী প্রসঙ্গে লিখেছেন, *"সার্থক শিক্ষার সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে যেমন শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠ্যসূচীর প্রয়োজন, উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের।"*

শিক্ষাবিদ ওয়াল বলেছেন, *"The Teacher is a social force for moulding the young, tramsmitting the culture heritage, for in culcating values, ideals and mode of behaviour on which the community and evolution of humanity depend."*

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতেন। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন, যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের কোন মিল ছিল না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সনাতন ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

'সুশিক্ষাই' জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। কিন্তু আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সকল উন্নতির চাবিকাঠি-এ কথা বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। তাই আমরা 'সুশিক্ষা'-এ শব্দটির উপর নজর দিচ্ছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে বারেক ফিরে তাকালেই দু'টো দিক লক্ষ্য করা যায়। দিক দু'টো হচ্ছে-গতানুগতিক ও আধুনিক। এ কথা সত্য যে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি একমুখী হওয়ায় শিক্ষার্থীর প্রকৃত মেধাও মননের বিকাশ হচ্ছে না। এ গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলের সৃষ্টি। যুগ-যুগান্তর পরেও আমরা এ শিক্ষা পরিহার করতে পারিনি। আমরা কিন্তু ঐ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির জের বহন করে চলেছি তা হল— (ক) সমাজের পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করছে (খ) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান করছে। সাধারণ শিক্ষার উপর জোড় দিয়ে বেকার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশের আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এরা কিন্তু এ দেশেরই জনগণের সেবক। জনগণের খেটে খাওয়া অর্থে পরিচালিত হয়েও সাধারণ মানুষের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে। তাদের পোশাকে, চলনে, বলনে, আচরণে, চেহারায় জমিদারী হাবভাব বিদ্যমান। আমার এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য ঐ 'সুশিক্ষা' শব্দটি। আমরা যদি ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যাই তবে দেখতে পাব-তারা প্রথমেই বলবে, "আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?" অথচ আমাদের দেশের চিত্র এর বিপরীত। তাহলে এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী।

আমাদের দেশের যারা কর্মকর্তা তারা নিজেদের এত বেশি বড় ভাবেন যে, তারা ভুলে যান তাদের বেতনের যোগান দেন এদেশের সাধারণ মানুষ। অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে প্রশাসনের সর্বস্তরে কি যে জমিদারী স্টাইল বিরাজমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এর কমতি নাই। তাই আমরা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির কথার উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি। গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের দেখে ভয় পেতো, ভীষণ ভয়। কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেতোনা, পারতনা তাদের প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটাতে। কোন শিক্ষার্থী কখনো কোন প্রশ্ন করলে তাকে

www.pathagar.com

ধমক দিয়ে স্তব্ধ করে দেয়া হতো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এর বিপরীত। এ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থী একে অপরের বন্ধু। উভয়ে তাদের স্ব-স্ব মত বিনিময় করে। শিক্ষার্থী নানা প্রশ্ন করে তার অজানা বিষয় জেনে নিতে পারে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শাসন করার বিষয়টি রয়েছে, তবে এ রকম শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। তাই একজন শিক্ষকই কিন্তু একজন ছাত্রকে দ্বিতীয় বার জন্ম দেন। এ কথা অনেক শিক্ষকই ভুলে যান। আমরা আধুনিক যুগে আধুনিকতা পেয়েছি ঠিকই কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষা পরিহার করতে পারিনি। এর পেছনে অবশ্যই পরিবেশ দায়ী। কেননা উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সেটা পরিহার করা যাচ্ছে না। আজকের শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা বিষয়ে জড়িত থাকতে দেখা যায়। তাদের পড়াশোনার সময় কোথায়? জীবন যাত্রা জটিল, সামাজিক অস্থিরতা, মাস্তান সমস্যা, সন্ত্রাস, হাইজ্যাক, বিনোদনের নানা মাধ্যম ইত্যাদি যতসব। তাই সামাজিক পরিবেশও উপযুক্ত বিকাশ লাভ হতে দিচ্ছে না।

আমাদের মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা ও শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে বিরাট বাঁধা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য প্রায় বিদ্যালয়গুলোতে ৭০/৮০ জন শিক্ষার্থী এক কক্ষে পড়াশোনা করছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে এত অল্প সময়ে বাড়ীর কাজ দেখে পড়া ধরা কিভাবে সম্ভব? শিক্ষকদের কারো সংসারের কাজ, ছাত্র পড়ানোর কাজ এবং বিদ্যালয়ে গিয়ে ৫/৬টি ক্লাস করার পর তার মানসিক অবস্থা তেমন ভাল থাকার কথা নয়। সেটিই লক্ষ্য করা যায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাই ভাল কিছু আশা করা যাবে কি করে? অবশ্য আমাদের বিদ্যালয়গুলো মাত্রাতিরিক্ত বন্ধ থাকে। একজন শিক্ষক যখন সব সময়ই পড়ালেখা করবে তবেই সে নতুন নতুন বিষয় উপস্থাপন করতে পারবে। এ জন্য তার নিয়মিত বিভিন্ন বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, পত্রিকা, টেলিভিশন দেখা দরকার। অথচ তাঁদের সময় নেই। সারাদিন বিদ্যালয় আর টিউশনি। ফলে শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু উপহার দিতে পারে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাটা গতানুগতিক হয়ে যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে হলে আমাদের যা দরকার তা হল (ক) পরিবেশ সুন্দর হতে হবে, (খ) মাতা-পিতার সচেতনতা, (গ) অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মেধা।

এখন আসা যাক বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন চলছে। বাংলাদেশের বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করা হচ্ছে শিক্ষাখাতে কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার এত বছর পরও কাঙ্ক্ষিত গুণগত মান অর্জিত হয়নি। সরকারী জরিপ অনুযায়ী দেশের সাড়ে আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠিকমত চলছে না। সেখানেও কিন্তু মানুষ গড়ার কারিগররাই শিক্ষা দিচ্ছে। জাতি গঠনে তাদের অবদান কিভাবে বিচার করা হবে সেটাই প্রশ্ন। প্রফেসর মোহাম্মদ আজহার আলীর ভাষায় :

"শিক্ষাদান একজন শিক্ষকের জন্য সার্বক্ষণিক পেশা। শিক্ষক মহোদয় বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক হিসেবেই থাকুন, আর বাড়িতে বাড়ির একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকুন, শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব তার সারা অন্তর জুড়ে থাকবে।"

ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের আর চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক আর এখন খুশী নন, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে আজকের শিক্ষক সমাজ। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করতে এখন তাদের কোন

www.pathagar.com

বাধা নেই, সারা বছর শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান না করে প্রশ্ন 'সাজেশন' দিতে তাদের এখন আর খারাপ লাগে না, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব এখন অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে অনেক। এর মূল কারণ শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে না তখন দূরত্ব তো সৃষ্টি হবেই।

শ্রেণীকক্ষে নির্ধারিত সময়টুকু তিনি দিতে চান না। কারণ কোন জবাবদিহিতা নেই। প্রধান শিক্ষক কিংবা পরিচালনা কমিটির আস্থাভাজন হতে পারলে তো কোন কথাই নেই। এভাবে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলো আজ নিয়মিত পরিদর্শন হচ্ছে না, জেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব হঠাৎ করে একদিন আসলেন, দেখে গেলেন। তিনি লিখে দিলেন সব কিছু ঠিকঠাক। অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক যেখানে নিয়মিত ক্লাসগুলো পরিদর্শনের কথা সেই কাজটুকু করার কথাও তিনি অনেক সময় ভুলে যান।

বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির কথাতো সবাই জানে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বর্গ দ্বারা বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তাদের মুখের উপর ন্যায়ের বাক্য পদদুলিত হয় প্রতিনিয়ত। নীতি কথা এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে নিম্নমানের প্রতিযোগিতা। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে নামে মাত্র। আগেই প্রার্থী ঠিক ঠাক। কোন রকম নামে মাত্র পরীক্ষা। প্রকৃত মেধার কবর রচনা করে শিক্ষক নিয়োগ করা হলো। কে এসবের খবর রাখে। ডুনেশন তো পাওয়া গেল।

শিক্ষকতার পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। মেধাও বলিষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিই হতে পারে আদর্শ শিক্ষক।

সামাজিক শক্তি হিসেবে শিক্ষক বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাসংস্থার সংযোগ রক্ষা করে চলেন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিবহনের মাধ্যমে সামাজিক বিবর্তন, ধারাবাহিকতা, মূল্যবোধ, জীবনাদর্শ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিফলন করার কাজে শিক্ষক সংযোগকারী সেতু হিসেবে কাজ করেন।

শিক্ষকদের কাছে সমাজের যে প্রত্যাশা, তা পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে সমাজকেও শিক্ষকদের দিকে তাকাতে হবে। শিক্ষার মানউন্নয়ন হক, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং সুশিক্ষিত নাগরিক যেমন জাতির প্রত্যাশা তেমনি শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি, তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও একান্ত কাম্য।

শিক্ষকরা সমাজের অগ্রবর্তী অংশ, তারাই পারে সমাজকে জাগ্রত করতে। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষকে বাঁচাবার মন্ত্র নিতে। এক সময় হাজার হাজার শিক্ষকরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এদেশবাসীকে জাগ্রত করে ছিলেন।

আমাদের জাতিগঠনের শিক্ষকরা আজ কেমন আছেন সেই দিকে একটু গভীরভাবে তাকাতে হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের নিয়মতান্ত্রিক এবং ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাস হতে বেসরকারি শিক্ষকদের প্রথমবারের মতো জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করে বেতন স্কেলের প্রারম্ভিকের শতকরা ৫০% রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেসরকারী শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদার আসনে উন্নীতের সূচনা করেছিলেন। এবং তাঁর আমলে শিক্ষকদের জন্য অভিন্ন চাকরি বিধিও প্রবর্তিত হয়েছিল যার ফলে শিক্ষকদের যথেচ্ছা নিয়োগ এবং বরখাস্তের অমর্যাদাকর প্রহসনের সমাপ্তি ঘটেছিল। পরবর্তীতে সরকারী বেতনক্রমে প্রদত্ত সরকারী বেতন ভাতাদির অংশ (অনুদান) সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়।

বেতন ভাতার বৃদ্ধির অন্তরালে রয়েছে শিক্ষক সমাজের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক শিক্ষককে মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শিক্ষকদের অনেক সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করেছে যা ইতোমধ্যে শিক্ষক সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। আবার শিক্ষকদের টাইম স্কেল পরিবর্তন, পেনশনের জটিলতা সরকার এখনো দূর করতে পারেনি। যার ফলে শিক্ষক সমাজ চিন্তিত।

শিক্ষকদের বেতনের ১০০% দাবী ছাড়াও আরো কিছু যুক্তিসঙ্গত দাবী আছে সেগুলোর দিকে সরকারকে অবশ্যই নজরদিতে হবে। বেসরকারী শিক্ষকদের ১০০% বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারী শিক্ষকদের অনুরূপে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা এবং ইউনেসকো এবং আই-এল-এর সুপারিশ মোতাবেক শিক্ষকদের চাকরিবিধি সংশোধন মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য অমানবিক জনবল কাঠামো স্থায়ীভাবে বাতিল এবং গভর্নিং বডিও ম্যানেজিং কমিটিকে সাজানোসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ কথায় আছে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক, সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হউক এ মুহূর্তে এটাই জাতির প্রত্যাশা। একটা আদর্শ জাতির জন্য দরকার সুশিক্ষা। আর এই সুশিক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষক সমাজকে।

www.pathagar.com

একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সামাজিকভাবে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। যাকে সামাজিক পেশা হিসাবে অভিহিত করা হয়। আর শিক্ষকতা হলো একটি মহান সামাজিক পেশা। সমাজ উন্নয়নে সমাজের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সমাজের মাঝে যিনি শিক্ষাদান বা নিজেকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত রাখেন তিনি হলেন শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষক কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজিতে একটি কথা আছে।

A good teacher is he who teaches better the learness and has a good characters.

একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? আসলে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী পরিমাপের কোন মাপকাঠি নেই। এক একজন শিক্ষকের মধ্যে এক এক ধরনের গুণ লুকায়িত যা তাঁকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভে সাহায্য করে। তবে শিক্ষাবিদ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড বলেন, 'একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ছাত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।' সাধারণত একজন শিক্ষকের মধ্যে কতিপয় গুণ থাকা দরকার যা তাঁকে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিম্নে আদর্শ শিক্ষকের কতিপয় গুণ উল্লেখ করা হলো :

১। আদর্শ শিক্ষকের মেজাজ মর্জি অবশ্যই নম্র হবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করবেন না। প্রাণবন্ত সংবেদনশীল আদর্শ মানুষ হিসেবে শিক্ষক হবেন সত্যিকারের সংগঠক ও পরিচালক।

২। রুচিশীল অনুকরণযোগ্য আদর্শ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের প্রধান গুণ।

৩। শিক্ষকের বাস্তব বুদ্ধিবৃত্তির সাথে হৃদয় বৃত্তি ও থাকা দরকার। অন্যকে বুঝাবার ও পরিচালনা করবার জন্য শিক্ষকের বুদ্ধিও ভালবাসা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৪। শিক্ষক আজীবন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সব সময় বিদ্যা অর্জন করেন, জ্ঞান লাভ করেন এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন যা ছাত্রদের মাঝে বিকশিত হয়।

৫। শিক্ষকের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ থাকা জরুরী। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানও শিক্ষাদান পদ্ধতি জানা না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে সঠিক জ্ঞান দান প্রায় ক্ষেত্রেই সক্ষম হবে না।

www.pathagar.com

৬। একজন আদর্শ শিক্ষকের চরিত্রে শিক্ষার্থী শিশু কিশোরদের জন্য মা বাবার মত ভালবাসা থাকতে হবে। তরুণদের দোষ ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাদের অন্তরে মমতা রসে সিক্ত করে শিক্ষাদান করে সুপথে তাদেরকে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "কি শিখাব, তা ভাববার কথা বটে; কিন্তু যাকে শিখাব, তার সমস্ত মনটা কি করে পাওয়া যেতে পারে, সেটাও কম কথা নহে।

৭। শিক্ষকের চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন থাকতে হবে, তেমনি তাঁর প্রবল ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে। একজন আদর্শবান শিক্ষকের জীবন ন্যায় নীতির প্রতি নিষ্ঠা এবং অপরকে প্রভাবিত করার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয়।

৮। শিক্ষকের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা থাকা চাই। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি চেহারা ও নামে চিনতে চেষ্টা করবেন এবং সব সময় নাম ধরে ডাকবেন।

৯। শিক্ষকতায় শৃংখলাবোধ থাকা এক জরুরী বিষয়। যার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ নেই, তিনি জীবনে কমই সফল হন।

১০। শিক্ষকের স্বাভাবিক সহজাতই তাঁকে করে রাখে কর্মময়, চির নবীনও প্রাণবন্ত। নবীন মনই তাঁকে শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরাগী করে তোলে, অনুরাগের প্রতিফলনে তিনি শিক্ষার্থীদের আপনজন' হবার যোগ্যতা, অধিকার ও গৌরব লাভ করেন। অমায়িকতা ও প্রসন্নতা চিরনবীনত্বের স্নিগ্ধ ঐশ্বর্য।

১১। প্রত্যয় দৃঢ় মানসিকতা উত্তম শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি কথায়ও কাজে, পোশাক ও রুচিতে পেশার ও কর্তব্য পালনে তিনি আদর্শবান, ধর্মপ্রাণ, সত্যপ্রিয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবেন। কেবলমাত্র আদেশ উপদেশ নয়, শিক্ষক নিজের অভ্যাস, অনুশীলন এবং জ্ঞান অভিজ্ঞতার লব্ধ বিচিত্র কর্মের মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্রে পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হবেন।

১২। শিক্ষকের অতিবড় হাতিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিদ্যালয়ের যে কোন আকস্মিক সমস্যার তাৎক্ষণিক মোকাবেলার জন্য অতিদ্রুত একটি বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক সমাধানে পৌছতে হয়। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু কোন ও সমস্যায় দ্রুত সুরাহার উপযোগী একমাত্র উপায় উপস্থিত বুদ্ধি।

১৩। নিরলস নিষ্ঠা শিক্ষকের অন্যতম গুণ।

১৪। একজন আদর্শ শিক্ষক একজন আদর্শ ছাত্র। সুশিক্ষকের সাধনাই হচ্ছে সারাজীবন ছাত্র থাকবে।

১৫। আদর্শ শিক্ষক হবেন নিরপেক্ষ, মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। মানবিকতাবোধ, সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সংবেদনশীলতা তাঁর অন্তরে জাগ্রত থাকবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ুনের ভাষায়, "Without good teachers even the best of Systems is bound to fail and with good teachers even the defects of a system can largely be overcome." শিক্ষাবিদ গিলবার্ট হেইট (Gilbert Height)-এর মতে, একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি :

১। শিক্ষার্থী প্রীতি ঃ শিক্ষার্থীর প্রতি তার স্নেহ, মমতা, দরদ ও ভালবাসা থাকতে হবে। ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

২। **বিষয় প্রীতি ঃ** যে বিষয় তিনি পড়ান সে বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে তাঁর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ফলে শিক্ষার্থী অতি সহজে বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হবে।

৩। **পেশা প্রীতি ঃ** তিনি হবেন তাঁর পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে শিক্ষক পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে ব্যর্থ হবেন সে কখনও আদর্শ শিক্ষক হতে পারবে না। কাজেই শিক্ষক পেশাকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে হবে। শিক্ষকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Teacher ইংরেজি সাতটি বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা গঠিত। এর প্রতিটি বর্ণ দ্বারাই আবার কতগুলো অর্থপূর্ণ শব্দের অবতারণা করা যায়, যার সম্মিলিত প্রভাবেই Teacher শব্দের উৎপত্তি এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আরো অর্থবহ।

TEACHER

T. Talented – প্রতিভাশালী
Tactful – কৌশলী।
Temperate – সংযত।
Trustry – বিশ্বাসী।
Truthful – সত্যবাদী।

E. Earnost – আন্তরিক
Elate – উৎফুল্ল।
Encouraging – উৎসাহোদ্দীপক।
Eurgetic – উদ্যমশীল।
Export – দক্ষ

A. Actor – অভিনেতা।
Active – কর্মঠ।
Administartor – প্রশাসক।
Amiable – অমায়িক।
Amusing – বিনোদক।

C. Caroful – যত্নশীল।
Creative – প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।
Competent – যোগ্য।
Chieftain – নেতা।
Chaste – চরিত্রবান।

H. Healthy – সু-স্বাস্থ্য।
Honest – সৎ।
Humane – দয়ালু।
Helper – সাহায্যকারী।
Humorist – রসিক।

E. Easy – সহজ।
Eloquent – বাকপটু।
Editor – সম্পাদক।
Evaluator – মূল্য নিরূপনকারী।
Emotional – আবেগদীপ্ত।

শিক্ষাবিদ Gilbert বলেন, "One of the most important qualities of a eachers is humor."

R. Reader পাঠক।
Reformer – সংস্কারক।
Regular – নিয়মিত।
Respansible – দায়িত্বশীল।
Researcher- গবেষক।

উপরে বর্ণিত গুণগুলি সামনে রেখে প্রত্যেক শিক্ষককেই এইগুলো অর্জন করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

www.pathagar.com

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ আল ফ্রেড নর্থ হুয়াইটহেড এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে, জ্ঞান অর্জনের এবং তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার একটা আর্ট।" (Education is the acquisition for the utilization of knowledge.) সক্রেটিসের মতে, "নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।" ফেডারিক ফ্রোয়েবেল এর মতে, "সুন্দর, বিশ্বস্ত এবং পবিত্র জীবন উপলব্ধি হল শিক্ষা।"

শিক্ষাবিদ জন এ্যাডাম্স শিক্ষাকে "মানুষ গড়ার কারিগর" (A maker of many) হিসাবে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য কারিগর হওয়া যত সহজ মানুষ গড়ার কারিগর হওয়া তত সহজ নয়। কারণ অন্য বস্তু বা দ্রব্যকে যেভাবে ইচ্ছে রূপ দেয়া যায়। কারণ এসবের মুখে ভাষা নেই, ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, নেই স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষের রয়েছে মৌলিক সত্ত্বা, বিবেক, বুদ্ধি, স্বাধীনতা। সৃষ্টিকর্তাই মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই মানুষ সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ স্বাধীন বলে বাঁধা ধরা নিয়ম শৃংখলার মধ্যে থাকতে চায় না। তাই স্বাধীন মানুষকে শিক্ষার অধীনে আনা একটু কষ্ট সাধ্য হবেই। এই স্বাধীন জীব মানুষকে শিক্ষাদান কার্যে যারা নিয়োজিত তাঁরাই শিক্ষক নামে পরিচিত। আর এই শিক্ষক যখন আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁর শ্রম ও মেধা শিক্ষাদান কার্যে ব্যয় করেন তখন আমরা তাকে আদর্শ শিক্ষক বলতে পারি। একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা। তিনি একজন সু-দক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ সাধনকারী এবং চরিত্র গঠনকারীও বটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "যিনি শিক্ষক হবেন তাঁকে ছাত্রও হতে হবে।" শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণে মনের তারুণ্য নষ্ট হতে পারে না। বরং তিনি সব সময়েই ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন এবং তাদের মনের কাছা কাছি থাকবেন!" বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা পরিবেশ অনেকটুকুই দূর হয়ে যাবে যদি শিক্ষকগণের মাঝে থাকে পাণ্ডিত্য, গাম্বীর্য ও ব্যক্তিত্ব।

সু শিক্ষক মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। প্রথম দর্শনে যেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের মন মানসিকতা বিচার করতে পারে।

মনে অশান্তি থাকলে ঔষধেও কাজ হয় না। একজন শিক্ষক হবেন সুস্বাস্থের অধিকারী। শান্ত মেজাজ হাসিখুশি মন শিক্ষকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে আকুল প্রেরণাসহ কাজে ভাল কৌশল প্রয়োগে সুনিপুণ হবেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আনন্দহীন শিক্ষা কোন শিক্ষাই নয়।" মরমি সাধক কবি লালন শাহ নিজেকে প্রশ্ন করেছেন অন্যভাবে, মনরে, তুই কী মানস মুকুল ভাজবি আগুনে।

একজন আদর্শ শিক্ষকের ভিতর এই বোধটুকু থাকা দরকার যে আমি আমার দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছি। যে শিক্ষক নিজেকে ফাঁকি দেয় না–তাঁর শিক্ষার্থীর মাঝে ফাঁকি দেওয়ার মনোভাব গড়ে উঠে না। আজ অধিকাংশ শিক্ষকের মুখে আক্ষেপের সূর ধ্বনিত হয়। যেমন শিক্ষার্থীরা এখন আর শিক্ষকদেরকে শ্রদ্ধা করে না, মান্য করে না, লেখা পড়ায় ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। আজ শিক্ষকদের ভেবে দেখার সময় এসেছে, খুঁজে দেখার সময় এসেছে কেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদেরকে মান্য করতে পারছে না বন্ধু ভাবতে

www.pathagar.com

পারছে না। এই জন্য দায়ী শুধু শিক্ষার্থী নয়, দায়ী পারিবারিক, সমাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এক কথায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। বাইরে যাদের নিরাপত্তা নেই ঘরে যাদের সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই কিংবা যে ঘরে রাত ১২টা পর্যন্ত ভিসিয়ারের প্রচণ্ড শব্দ, মেহমানদের জমজমাট আবার সে ঘরের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়াশুনা আদায় করা কতটুকু সম্ভব। এইরূপ বিশাক্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যদি অনুকুল পরিবেশ পায়, পায় আদর্শ শিক্ষকের আদর্শ শিক্ষা পায় তাহলে তারা কিছু সময়ের জন্য ফেলতে পারে স্বস্তির নিঃশ্বাস। এমনিভাবে দেখা যাবে আদর্শ শিক্ষক মণ্ডলী আজ যে আদর্শের বীজ বপন করেছেন শিক্ষার্থীদের মাঝে তারাই একদিন গড়বে আদর্শ সংসার, সমাজ ও সুন্দর পৃথিবী।

একজন আদর্শ শিক্ষককে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে নানা ধরনের আচার, আচরণ ও অভ্যাস নিয়ে আসে। অনেকে অত্যন্ত মেধাবী, কেউ স্বল্প মেধাবী, কেউ হয়ত বাবার অতি আদরের সন্তান, কেউ হয়ত সকল প্রকার স্নেহ, আদর ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। কেউ সরল সোজা, কেউ একটু অভিমানী, কেউ বা জটিল। শিক্ষার্থী যে পরিবেশ বা অবস্থা থেকে আসুক না কেন সেগুলো শিক্ষক অত্যন্ত বুদ্ধিমতার সাথে, সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে, বন্ধুর মত আচরণ করে সুকৌশলে শিক্ষা দেবেন।

একজন আদর্শ শিক্ষক পাঠকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন, তিনি ছাত্রদের সজাগ করে রাখেন এবং তাদের শেখার জন্য উৎসাহী করে তোলেন। প্রত্যেক ছাত্রের ভিতর মূল্যবান সম্পদ লুক্কায়িত থাকে। একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রত্যেক ছাত্রের লুক্কায়িত সম্পদ আবিষ্কার করার যোগ্যতা থাকতে হবে। বাইরের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ প্রভাব এবং বিরুপ সমাজে প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন এবং দারিদ্র ও সামাজিক অবস্থানে তিনি মর্যাদা সম্পন্ন হবেন।

শিক্ষক দেশ ও জাতির কারিগর এবং সম্ভাবনাময় সংগঠক। ব্যাপক প্রজ্ঞা সম্পন্ন এবং জ্ঞান-দক্ষতার সুনিপুণ শিক্ষক জাতীয় সম্পদ। জাতির বুনিয়াদ গঠনে এবং দেশের যশ সমৃদ্ধি সম্প্রসারণে তথা জাতীয় আদর্শ ঐতিহ্যের ধারা সংরক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা অন্য যে কোন পেশাগত কর্মীর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জাতি গঠনের দায়িত্বপূর্ণ কাজে শিক্ষকের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি কাজের মুল্যবোধ এবং দায়িত্বের নিরিখে প্রত্যেকের স্থান নির্ধারিত হলেও শিক্ষকের চেয়ে মুল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান অপর কেউ দাবী করতে পারে না। সে জন্যই সেই প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি দেশেই শিক্ষককে শ্রেষ্ঠতম সম্মান ও মর্যাদা দেবার সভ্যকাহিনী কিংবদন্তিরূপে আজ ও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বর্তমান সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশে আর সেই পরিস্থিতি নেই। এখন আর তেমন শিক্ষককে মর্যাদা দেওয়া হয় না। এখন আর সেই বাদশাহ আলমগীরের পুত্র কর্তৃক শিক্ষকের পা ধৌত করে দেবার মর্যাদা নেই। এখন শিক্ষক পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। অপমানিত হচ্ছেন। ছাত্র দ্বারা শিক্ষক প্রহৃতের ঘটনা ও ঘটছে। কিন্তু কেন এই অবস্থা? এর জন্য দায়ী কে? প্রকৃতপক্ষে এককভাবে কাউকেই দায়ী করা যায় না। মূলত:

www.pathagar.com

এর জন্য দায়ী ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারী অবস্থা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তা নিম্নরুপ :

অধিকাংশ শিক্ষকগণই বর্তমানে ক্লাসে মনোযোগী হতে পারেন না। তারা ক্লাসে সামান্য বুঝিয়ে বেশি পড়া দিয়ে ক্লাস ত্যাগ করেন।

আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকগণ ক্লাসে পড়াবার চেয়ে বাসায় ছাত্র-ছাত্রীকে এনে প্রাইভেট পড়ানোর দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। তাদের কাছে ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়ানো প্রধান দায়িত্ব হয়ে গেছে।

ক্লাসে পড়ানোর সময় কোন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের কাছে কোন প্রশ্ন করলে, তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। কেননা শিক্ষক ঐ প্রশ্নের উত্তর জানেন না।

শিক্ষকগণ বিভিন্ন বেসরকারী কোচিং সেন্টারের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে এর প্রভাব সমাজে সকলের উপর পড়ছে এবং প্রকৃত শিক্ষা হারিয়ে যাচ্ছে। কেননা শিক্ষা কোন ব্যবসার পণ্য সামগ্রী নয়। অথচ আজ তাই হচ্ছে।

যারা শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে, তারা আগেই প্রশ্ন পত্রের খবর পেয়ে যায়, অপর পক্ষে যারা পড়ে না, তারা পায় না। ফলে শ্রেণীকক্ষে দুটি দলে বিভক্ত হয় ছাত্র-ছাত্রীরা এবং একদল সম্মান করে, অপরদল অসম্মান করে শিক্ষকগণকে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষা চলাকালীন সময় কিছু শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নকলে সহায়তা করে যা তাঁর সম্মানে হানি ঘটায়।

শিক্ষকগণ বর্তমানে রাজনীতিতে কঠোরভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে রাজনীতিক দলে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ছেন। এতে করে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি বদলিসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রাজনৈতিক অন্তরালে চলে গেছে। ফলে শিক্ষকদের যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় প্রভাবই মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষকগণ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণে ছাত্র-শিক্ষক দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে একদল শিক্ষকদের কাছে আসার সুযোগ পাচ্ছে এবং অন্য দল পাচ্ছে না-যা শিক্ষকের সম্মানহানি ঘটায়।

কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে হীনমন্যতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি উচ্চ শিক্ষিত তাঁর শিক্ষাভিমান শিক্ষার্থী ও অভিভাবক থেকে তাঁকে দূরে রাখে। তিনি জ্ঞানী হয়েও তাঁর জ্ঞান কারো সাহায্যে আসে না। আর যিনি ডিগ্রীধারী অথচ জ্ঞান বিতরণের উপযোগী তাঁর বাক-বৈদগ্ধ্য নেই, শিক্ষা দক্ষতা নেই, তিনি ইচ্ছা প্রস্তুত পলায়নী মনোভাব নিয়ে কাজে ফাঁকি দেন।

শিক্ষকগণের বেতন ভাতার পরিমাণ ও তুলনামূলকভাবে কম। একজন শিক্ষকের উপর তাঁর পরিবার বর্গ নির্ভরশীল। তাঁকে অল্প বেতনে বড় পরিবার বহন করতে হয়। ফলে তাঁর মধ্যে অর্থ চিন্তা কাজ করে। আর অর্থ চিন্তা থাকলে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞান দান সম্ভব হয়ে উঠে না।

"শিক্ষা সমস্যা শীর্ষক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "শিক্ষক যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসেছেন, যদি তাঁর জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে হয়, তার জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তার স্নেহের দ্বারা তার কল্যাণ সাধন

www.pathagar.com

করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন। তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যা মূল্যের অতীত। সুতরাং ছাত্রের নিকট হতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে আপন কতর্ব্যকে মহিমান্বিত করেন।"

বস্তুত আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, শিক্ষকের গৌরব করবার মত সম্পদ কী বা আছে? না আছে অর্থের প্রাচুর্য, না আছে ক্ষমতার দম্ভ, না আছে পদমর্যাদার চাকচিক্য। কিন্তু এত কিছু না থাকলেও তার যা আছে, অন্য-কারো তা নেই। বিদ্যাই তাঁর ভূষণ। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিতরণ করে মানুষ গড়ে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ মহান ব্রতে তিনি ব্রতী। তাঁর গৌরব তাঁর পার্থিব সম্পদ এর অপার্থিব অমূল্য সম্পদ জ্ঞান-বিদগ্ধ চিন্তা চেতনা। তাছাড়া, তাঁর ব্রতই তাঁর গৌরব। সমাজও জাতির বুনিয়াদ গঠনে প্রাথমিক ভিত্তিটির স্থপতি-তো তিনিই। এ গৌরব তাঁকে আত্মপ্রসাদের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে। এ গৌরব তাঁর মহামূল্যবান পুরস্কার।

ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশ এবং প্রকাশে শিক্ষকের উৎসাহ, সাহায্য ও পরামর্শ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর্থিক দিকে অসচ্ছল অথচ বিদ্যার সম্পদবান শিক্ষকদের কাছে প্লেটো, এরিস্টটল, আলেকজাণ্ডার, সক্রেটিস, শিরোমনি, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, আওরঙ্গজেব, ইকবাল, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ মহান নেতারা পেয়েছেন নিজ নিজ জীবনের সত্য পরিচয় এবং নিজ প্রবণতাও দক্ষতা প্রকাশের উপযোগী উদ্দীপনা। যোগ্য ছাত্রকে জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবার মতো গৌরব শিক্ষকের আর কী হতে পারে?

শিক্ষার্থীর জীবনে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করতে পারার মধ্যেই শিক্ষক পান পরম পরিতৃপ্তি। শিক্ষকের জীবনাদর্শ রূপ ধরে শিক্ষার্থীর বিকাশমান জীবনে, ধীরে ধীরে। শিল্পী যেমন নিজের সাধ-সাধনার প্রতিফলনে শিল্পকর্মের সার্থকতা বিচার করে, গৌরব ও আনন্দবোধ করেন, শিক্ষকও তেমনি তাঁর শিক্ষা ব্রতের সাফল্য উত্তম ছাত্রের চরিত্রে অবলোকন করে মুগ্ধ হন, ধন্য মনে করেন নিজেকে।

www.pathagar.com

শিক্ষার অর্থ, সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

(ক) শিক্ষা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'শাস' অর্থ শাসন করা। নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া। শিক্ষা শব্দের সমার্থক 'বিদ্যা' শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা। দু'টো শব্দের এ অর্থগুলোর প্রতি একটু খেয়াল করলেই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টো শব্দই বিশেষ কৌশল অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে 'শিক্ষা' বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা কিংবা বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ত করাকে বুঝায়। বাংলা 'শিক্ষা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education' শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। একটি মতানুসারে 'Education' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন 'Educare' শব্দ থেকে। এ শব্দটির অর্থ লালন পালন করা, প্রতি পালন করা বা পরিচর্যা করা। এ সম্পর্কে অন্য একটি মতবাদ হচ্ছে 'Education' এর উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন 'Educare' শব্দ থেকে। 'Educare' অর্থ 'নিষ্কাশন করা' কিংবা ভিতর থেকে বাহিরে নিয়ে আসা, কিংবা নির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া। তৃতীয় মতবাদ 'Education'-এর উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন 'Educatum' শব্দ থেকে। এর অর্থ শিক্ষণ বা শিক্ষাদানের কাজ। এ তিনটি ল্যাটিন শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করলে আমরা 'Education' শব্দের তিনটি অর্থ পাই :

(ক) যথাযথ যত্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা জীবন পথে চলার জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত কৌশল হাসিল করতে সাহায্য করা।

(খ) জীবনকে গড়ে তোলার জন্য তার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করা কিংবা যথাযোগ্য নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার জীবন পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(গ) নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা।

(খ) শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষা মানুষের জীবনে অমূল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এর উপর নানা শিক্ষাবিদ দার্শনিক জ্ঞানীদের নানা মতবাদ থাকলেও একে যুগে যুগে বহুভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং এসকল সংজ্ঞার কোনটিই এককভাবে যুগের দাবী মেটাতে সক্ষম নয়। কাজেই পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি সূত্রকে বিশ্লেষণ না করে শিক্ষার মূল অর্থ যে শব্দ থেকে উদ্ভুত সেই শব্দ দ্বারা তৈরি সূত্র এবং এই সূত্রের মূল অর্থের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে উদ্ভুত সূত্রাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

শিক্ষার মূল অর্থ অনুধাবনের চেষ্টাই সবচেয়ে ভাল বলে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই শিক্ষার সূত্র সংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত আকারে রূপ দেয়ার চেষ্টা করছি।

সাধারণ অর্থে বিদ্যাভ্যাসকে শিক্ষা বলা হয়। যিনি যত বেশি পুঁথিগত জ্ঞান লাভে সক্ষম, তিনি তত বেশি শিক্ষিত বলে সমাজের কাছে সমাদরও স্বীকৃতি পান।

আভিধানিক অর্থে 'শিক্ষা' বলতে অভ্যাস, শেখা বিদ্যাভ্যাস, অধ্যায়ন, চরিত্রোন্নতি 'প্রভৃতিকে বুঝায়। সু-অভ্যাস বা ক্রমাগত অনুশীলন শিক্ষার জন্য অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার চরমোৎকর্ষ, চরিত্রোন্নতি, বিদ্যাভ্যাস লব্ধ শিক্ষাকে স্থায়ী করে। অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিতও সুনিগড়িত ব্যক্তিসত্তার কাঙ্ক্ষিত বিকাশ সাধন সার্থক শিক্ষার লক্ষ্য। ল্যাটিন শব্দ Educo (rear) থেকে ইংরেজি Education শব্দের উৎপত্তি। Educo শব্দের মূলগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, E=out; duco= to Lead/to draw, out বা পরিচালিত করা, বের করা, প্রতিভাত করা। তাহলে শিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Education-এর তাৎপর্য হচ্ছে মানবমনের সহজাত বৃত্তি বা সম্ভাবনাকে বিকশিতও পরিচালিত করাই শিক্ষা। অন্যকথায়, শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষা।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মতবাদ দিয়েছেন। গ্রীক শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "যখন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষকের কাছে আসে তখন তার মন একদম শূন্য থাকে না। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, তার মন দাগবিহীন এক টুকরো সাদা কাগজের মত থাকে না; বরঞ্চ তার মন নানাবিধ অভিজ্ঞতা, অবলোকন প্রবণতায়, বিভিন্ন প্রশ্নভারে, নানাবিধ ভাবাদর্শন এবং প্রতিনিয়ত অর্জিত অতিসাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে।

প্লেটো বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনের পরিপূর্ণ বিকাশ, যাতে সে তার অন্তর চক্ষু দ্বারা সব জিনিস সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।" তাঁর মতে, "শিক্ষা কোন নতুন নীতির জন্ম দেয় না। বরঞ্চ পৃথিবীতে বিদ্যমান নীতিমালাকে পথ প্রদর্শন বা পরিচালিত করে।"

শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানুষ যে পূর্ণতা নিয়ে ধরাধামে আগমন করে, তার যথার্থ বিকাশই শিক্ষা।" অর্থাৎ তাঁর মতে, "জ্ঞান মানুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা ঘুমন্ত অবস্থায় তার মাঝে বিদ্যমান এবং শিক্ষা তাকে জাগিয়ে তোলে।"

মহাত্মাগান্ধী বলেছেন, "মানুষের যে সকল ভালগুণ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে, তার যথাযথ বিকাশ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা।"

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউই বলেছেন, "শিক্ষাই জীবন, শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়।" জন ডিউই তার মতবাদের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, "অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবহারের আশানুরূপ পরিবর্তনই শিক্ষা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।"

বনফুলের মতে, "সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক রূপে বিকশিত হয়, তার নামই শিক্ষা।"

www.pathagar.com

হেনরী এ্যাডামসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে ধনাগারও সংস্কৃতি-যা মৃত্যুহীন।"

জোনাথ সুইটির মতে, "শিক্ষা আত্মার একটি চোখ।"

মরগান কিং এবং রবিনসনের ভাষায়, "আচরণের যে কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকে শিক্ষা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা অনুশীলন বা অভিজ্ঞতার ফলে সংঘটিত হয়।

দার্শনিক প্লেটোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি।"

দার্শনিক এরিষ্টটলের মতে "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা।" *(Education is the creation of a sound mind in a sound body.)*

শিক্ষাবিদ জন এমোস কমেনিয়াসের মতে "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক-পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ রুশোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ।" *(Education is the child's development from within.)*

ফ্রেডারিক হার্বার্টের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন।" *(Education is the development of good moral character.)*

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে কেবল তথ্যই পরিবেশন করে না বরং বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" *(The highest education is that which does not give us information but marks our life in harmony with all existence.)*

(গ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানব মনের বিকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের পথে পরিচালনা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। প্রতিটি জিনিসের যেমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে তেমনি শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজের যুগোপযোগী পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য নির্মিত হয়। যে কোন রাষ্ট্রের সমাজ, মানস, তার সাংস্কৃতিক ভাব-ভাবনা ভৌগোলিকও রাজনৈতিক পরিবেশ তথা জাতীয় আদর্শের প্রভাবও প্রতিফলনে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক। মানব শিশুর বিকাশ সাধনের মূল লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন এবং এই জীবন তার সমাজ, জাতীয়, ঐতিহ্য ও আদর্শের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক রক্ষা করে রূপায়িত হবে এটাই কাম্য। সুতরাং দেশ কালের পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য পরিমার্জিত হয়ে থাকে।

শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে পরিচালিত করা। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ মতবাদ দিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিক ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্যের আবিষ্কার ও শিক্ষার অপনোদন।"

www.pathagar.com

গ্রীকদার্শনিক ও স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্লেটোর মতে, "মনের ও দেহের পরিপূর্ণ উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত।"

এরিষ্টটল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন, "ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত কার্যকলাপের মাধ্যমে সুখ আহরণই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

শিক্ষাবিদ কমোনিয়াসের মতে, "শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

শিক্ষাবিদ জনলক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্তকরণ।"

স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ পেস্টালৎসী বলেছেন, "একই সাথে শরীরও মনের পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

শিক্ষাদান ও পদ্ধতির জনক হার্বার্ট বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণবিকাশ এবং তার নৈতিক চরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত আত্মপ্রকাশ।"

শিশু শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল মন্তব্য করেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একটা সুন্দর বিশ্বাসযোগ্যও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।"

শিক্ষাবিদ পার্কারের মতে, "একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে সমাজে আত্মপ্রকাশের জন্য যে সমস্ত গুণ নিয়ে শিক্ষার্থী ধরাধামে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই সফল গুণের যথার্থ বিকাশ সাধন।"

আধুনিকও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডিউই বলেছেন, "শিক্ষা উদ্দেশ্য হবে মতবাদের ধারাবাহিক পূর্ণবিন্যাস।"

উপরোক্ত শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত মতবাদের উপর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে যে সত্য উপস্থাপন করে তার মূল স্তর হচ্ছে, মানব সভ্যতার প্রতিটি স্তরে মানুষের গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ সাধনে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্য লক্ষণীয় তা নিম্নরূপ :

১। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাদের জীবনে স্ব-স্ব ধর্মকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়ে থাকেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনকেই তাঁরা আজ ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করেন।

২। শরীরও মন পুষ্ট না হলে কোন কাজেই সফলতা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং শিশুর শরীর ও মনকে সবলও কার্যক্ষম করা শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলা যায়।

৩। শিক্ষায় কোন নীচ সংকীর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। জ্ঞানলাভের আনন্দ উপভোগই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের ফলেই মানুষের রুচিও আচার ব্যবহার উন্নত হয় এবং তার দ্বারাই উন্নতিও সুসভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

৪। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মানুষ যতই গর্ববোধ করুক না কেন, সেও শরীরের দাবী চাহিদা সম্পূর্ণ আগ্রহ্য করতে পারে না। তাকে সর্বাগ্রে উহা পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এই শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা।

www.pathagar.com

৫। উপযুক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক প্রস্তুত করাকে পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হিসাবে আজও চিহ্নিত।

৬। সম্পূর্ণ বা সুন্দর মহৎ ও উন্নত জীবন প্রস্তুত করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

৭। বর্তমান সময়ে চরিত্র গঠনই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বা একমাত্র লক্ষ্য বলা হয়। রেমন্ট অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বলেছেন, "ছাত্রকে মাংসপেশীর সম্পদ দান, তার জ্ঞানে সম্পূর্ণতা সাধন বা তার সুকুমার ভাবাবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষকের চরম বা সর্বপ্রধান লক্ষ্য নয়। ছাত্রের চরিত্র বল বৃদ্ধিও তার নির্মল চরিত্র গঠনই শিক্ষকের চরম লক্ষ্য।"

৮। জাতিগঠনও জাতীয় উন্নতি করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন এই উভয় দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা করলেই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী এবং সম্পদশালী জাতি গড়ে উঠতে পারে।

৯। ছাত্রজীবনে ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত মেধাবিকাশে সহায়তা দান করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

১০। ছাত্রজীবনে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীকে নৈতিক শিক্ষাদান শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে চলতে হবে এবং ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের এ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত শিক্ষাদান ও সফলতা লাভ করা অসম্ভব।

(ঘ) শিক্ষার পরিধি

শিক্ষার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শিক্ষার পরিধি রুপ লাভ করে। শিক্ষার সূত্র যদি শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর উন্নতির সঙ্গে এক করে দেখে তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব তাঁর ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় নাগরিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা এবং যা সুশিক্ষা ব্যতীত অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়। কতগুলো বিধিবদ্ধ নীতিকথা মুখস্ত করে শিক্ষার্থীর যে শিক্ষা লাভে প্রয়াস পায় তা বস্তুত পক্ষে সমগ্র শিক্ষার ১০ ভাগের একভাগ এবং দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য এই শিক্ষাই আমাদের দেশের গোটা শিক্ষাঙ্গনে শিকড় গেড়ে বসে আছে। যাকে রাতারাতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন আদৌ সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার পরিধি তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। আর এই বস্তুগুলো হচ্ছে শিক্ষার্থীর (১) মানসিক (২) নৈতিকও (৩) শারীরিক উন্নতি সাধন। তাই সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত শিক্ষার সূত্রানুযায়ী আমরা শিক্ষাকে একসাথে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিকও নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণবিকাশ সাধনের মাধ্যম বলে অভিহিত করতে পারি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপূর্ণবিন্যাস করতে আমেরিকার শিক্ষা কমিশন যে মূল্যবান নীতিমালার আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনের ভাষা অনুযায়ী শিক্ষার পরিধি মূলত :

www.pathagar.com

১. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ
২. আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন।
৩. পরিবারের সু-সভ্য হিসাবে পরিচিতি হওয়া।
৪. ভালভাবে জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা অর্জন।
৫. নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ।
৬. অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার।
৭. নৈতিক চরিত্র লাভ প্রকৃতির সমন্বয়ে রূপ লাভ করা।

বাংলাদেশের শিক্ষা পরিধি এরূপ হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষা জীবন পরিপূর্ণতাও সফলতা লাভে উক্ত মূল্যবান ভাষাগুলোর কোনটিকেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

(ঙ) শিক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে মনে রাখতে হবে শিক্ষা পদ্ধতি মূলত শিক্ষার ধারণা থেকে উদ্ভূত শিক্ষাকে যখন শিক্ষার্থীর সহজাত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তখন আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে বিরাজমান সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের সোপান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর কাছে কোন কিছু নিয়ে বক্তৃতা প্রদানের ঘোর বিরোধী। পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মনকে কতগুলো তৈরি তথ্য ও জ্ঞান দ্বারা ভারাক্রান্ত করাকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি কোনভাবেই অনুমোদন করে না। শিক্ষাকে যেহেতু শুধু পড়ানোর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান হিসেবে ধরা হয়, সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতির কাজ শিক্ষার্থীকে পড়ানোর চেয়ে আরো মূল্যবান কাজ আছে তা সঠিকভবে অনুধাবন করানো। পড়ানো নীতি কথাগুলো যদি শিক্ষার্থীকে তার বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে না পারে তবে তার লব্ধ জ্ঞান মূল্যহীন হতে বাধ্য। শিক্ষা পদ্ধতির কাজ হলো শিক্ষার বিষয়বস্তুর এমনভাবে রুপায়িত করা যা উপস্থাপনে শিক্ষার্থী তার মানসিক ভারসাম্য না হারিয়ে সহজও সাবলীলতার সঙ্গে তা আয়ত্ত করতে পারে।

শিক্ষাবিদ সক্রেটিস তাঁর সময়ের শিক্ষা পদ্ধতির মূলসূর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সুষ্ঠুও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের মূল কথা হচ্ছে শিশুকে কোন কিছু বলে প্রশ্নের মাধ্যমে তার কাছ থেকে নানাবিধ তথ্য আদায়ের চেষ্টা করতে হবে এবং প্রশ্ন ধরা হবে। শিশু যা জানে তা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তাকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়া।" অর্থাৎ শিক্ষার কাজ হবে শিশুকে সাহায্য করা যাতে সে তার পর্যবেক্ষণও অন্যান্য লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তার বক্তব্য সহজতর করে উপস্থাপন করতে পারে।

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন, "কেউ কখনো কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না, আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজেকে শিক্ষা দিতে হবে। বাইরের শিক্ষক শুধু উপদেশ দানের সাধ্যমে ভেতরের শিক্ষককে জাগ্রত করে কোন বিষয়কে আয়ত্ত করতে উৎসাহও দান করে।"

একটি চারাগাছের পরিচর্যায় নিয়োজিত মালির কর্তব্য আর একজন শিক্ষকের কাজের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। গাছ যেমন তার প্রয়োজনীয় উপাদান ঠিকমত

www.pathagar.com

পেলে আপনা-আপনি বেড়ে ওঠে, শিশুও তেমনি আপনা-আপনি বেড়ে উঠে যদি সে তার বর্ধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকমত পায়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষক যদি শিশুর চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সব আবর্জনা তিরোহিত করে শিশুর জ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত করে দিতে পারেন তবেই জ্ঞান আপনা আপনি শিশুর কাছে হাজির হয়। একজন শিশু সবরকম জ্ঞান নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করে থাকে। আর এই সঠিক পথ প্রদর্শনই শিক্ষাকূলের প্রধান কাজ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পুরানো পদ্ধতি অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীকে কেবল বলে দেয়া বা তাদের কাছে বিরামহীনভাবে কোন কিছু ব্যক্ত করাকে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনুমোদন করে না। নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী আত্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করবে এবং শিক্ষক থাকবেন সাহায্যকারী বা উপদেষ্টার ভূমিকায়।

(চ) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানবজাতির সফলতার মূলে রয়েছে শিক্ষা। পৃথিবীতে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী। ছাত্রজীবনে সফলতার মূল চাহিদা শক্তি শিক্ষার সুষ্ঠুব্যবহার। শিক্ষাছাড়া সামাজিক ও জাতীয় জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। এই শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স:) বলেছেন, "বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে তোমরা সুদূর চীন দেশে যাও।" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহানবী (সা:)-এর জন্মের পূর্বে আরবের জাতিসমূহ ছিল অশিক্ষিত, মূর্খ ও কুসংস্কারে জর্জরিত। মহানবী (সা:)-এর শাসনামলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আরবজাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। তৎকালিন সময়ে চীন ছিল শিক্ষার দিক দিয়ে একমাত্র উন্নত জাতি এবং চীন ছিল আরবদেশ থেকে দূরে অবস্থিত। আরবজাতিকে উন্নত করার জন্য মহানবী (সা:) শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এই উক্তিটি করেছিলেন। এই বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই।

মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি দেশের আর্থ সামাজিক বিকাশে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য আজ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য আজ আফ্রিকান দেশগুলো অনুন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত। কোন দেশের গণতন্ত্রকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র অচল।"

শিক্ষাই কেবলমাত্র একজন মানুষও একটি সমাজকে বিবেকবান আর অন্যদিকে উৎপাদনক্ষম করতে পারে। আর উৎপাদনক্ষম মানব সম্পদ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকে ছাত্রজীবন থেকেই যথাযথ পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, শুধুমাত্র শিক্ষাই মানুষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। করতে পারে তাকে সমস্ত সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিকারীর দক্ষও শক্তিশালী কারিগর।" শিক্ষা

www.pathagar.com

ছাড়া সভ্যতার সুফল ভোগ করা অসম্ভব। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে স্বীয় অবস্থান অর্জনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। লেখক শংকরের মতে, "পড়তে বা লিখতে না জানলে কোন সভ্যতার মর্মমূলে প্রবেশ করা যায় না। অক্ষরই তো এ যুগের মানুষকে উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি।"

শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, স্বচ্ছ করে। তাই শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্দরের ফুল ফোটে, অসুন্দর সেখানে অবস্থান নিতে পারে না।

মনীষী ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে মনের চোখ সে চোখের দেখা কখনো ভুল হতে পারে না।"

মনীষী সিসেরোর মতে, "যতোই উর্বরা হোক একটা ক্ষেত যেমন কর্ষণ ছাড়া ফসল দিতে পারে না। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মনের অবস্থা ও তেমনি।"

ডেমোক্রিটাসের মতে, "শিক্ষা ছাড়া কেউ জ্ঞান এবং নিপুণতা লাভ করতে পারে না।"

দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের দু'চোখের দৃষ্টি যতই প্রখর হোক না কেন আলো ছাড়া সে দৃষ্টির অন্তর্ভেদী ক্ষমতা সুতীক্ষ্ণ হয় না।

মনীষী জে, আর. লাওয়েল যথার্থই বলেছেন, "যে শিক্ষা আত্মাকে বলিষ্ঠ করে না, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে না, তা আদৌও শিক্ষা নয়।"

সমাজের ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায়ের নির্ভুল ব্যবধান একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই নির্ণয়, করা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজে মানুষও পশুর মাঝে যে বিষয়টি পার্থক্য তৈরি করে তার নাম জ্ঞান। শিক্ষা জ্ঞানের বাহন। যাদের মাঝে জ্ঞানের অভাব থাকে তাদের মাঝে প্রকৃত শিক্ষার অভাব পরিক্ষিত হয়। যারা শিক্ষার অভাবে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হয় তাদেরকে "মূর্খ নামে অভিহিত করা হয়। প্রবাদ আছে," মূর্খ মানুষ পশুর সমান।" মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ছাত্র জীবনে শিক্ষার বিকল্প নেই। ছাত্র জীবন আর শিক্ষা একে অপরের সাথে অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষা ছাড়া ছাত্র জীবন যেমন– কল্পনা করা যায় না; তেমনি সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে হলে শিক্ষার, প্রয়োজন অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে পারলেই শিক্ষাও ছাত্র জীবনের যথার্থ ফল পাওয়া যাবে। তাই গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, "শিক্ষার শিকড় তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি"।

www.pathagar.com

শিক্ষার বিভিন্ন মতবাদ

(ক) শিক্ষা-দর্শন

শিক্ষা ও দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শন শিক্ষার দিক নির্দেশনা করে এবং শিক্ষা দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করে। দর্শন ছাড়া শিক্ষা অন্ধ এবং শিক্ষা ছাড়া দর্শন খোঁড়া। মানুষের জীবন যাত্রাকে সুন্দর, গতিশীল, সাবলীল ও উন্নতি করার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত বিশ্বাস কার্যকর মৌলিক নীতিও মতবাদ। দর্শনের কাজ এসব নীতি ও মতবাদ অবলম্বনে সার্থক জীবন রুপায়ন।

(খ) শিক্ষা সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদ

বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই শিক্ষা তত্ত্ব একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শিক্ষা সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদগুলো হচ্ছে—

১. ভাববাদ (Idealism)
২. বাস্তববাদ (Realism)
৩. জড়বাদ (materialism)
৪. প্রকৃতিবাদ (Naturalism)
৫. প্রয়োগবাদ (Pragmitism)।

১. ভাববাদ ঃ দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন অথচ সবচেয়ে, আলোচিত মতবাদটি হচ্ছে ভাববাদ বা আদর্শবাদ। সাধারণ অর্থে ভাব বলতে কোন কিছু সম্বন্ধে মানুষের মনের ধারণা বুঝায়। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ভাব হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যম। অর্থাৎ ভাবের মাধ্যমে আমরা বিশ্বজগতকে উপলব্ধি করি। গ্রীক দার্শনিক এ্যানাক্সাগোরাসের 'দর্শন' চিন্তায় সর্বপ্রথম ভাববাদ রূপায়িত হয়ে উঠে। এ মতবাদে যে কয়জন বিখ্যাত দার্শনিক বিশ্বাস করতেন তাঁদের মধ্যে প্লেটো, সক্রেটিস, কান্ট, হেগেল, পেস্টালৎসী, ফ্রোয়েবেলও বার্কলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শন হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষই (শিশু) সৎ গুণাবলী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে এবং এসব গুণাবলী ঘুমন্ত অবস্থায় বা অবিকশিত অবস্থার শিশুর

www.pathagar.com

মাঝে বিদ্যমান থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিও পরিচর্যা ছাড়া শিশুর এই ঘুমন্ত সম্ভাবনার ও প্রতিভাকে বিকশিত করাই শিক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ। তাঁদের মতে, শিক্ষা শিশুর ঘুমন্ত সম্পাদনার পরিবর্তন বা বর্ধন করতে পারে না, তবে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য থাকবে প্রতিটি শিশুই যাতে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন অনুযায়ী কতিপয় মূলনীতির উপর শিক্ষা গ্রহণ করে।

২. বাস্তববাদ ঃ বাস্তববাদ অনুসারে কোন বস্তু যেভাবে অবস্থানে করে তাই তার অস্তিত্ব। বাস্তববাদের মূলকথা স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল বাস্তববাদের প্রবক্তা। বাস্তববাদীদের পোষিত মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ মতানুসারে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বস্তু এবং বস্তুর উর্ধ্বে যে বিষয়ের অস্তিত্ব আছে সে ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শন নিম্নরূপ :

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি। এর অর্থ নিজেকে জানো, কিন্তু কোন বিষয় শিক্ষা লাভ করতে হলে কাজের মাধ্যমে হাতে কলমে সম্পাদান করতে হবে। যে কোন বিষয়ে জানার মাধ্যমে শোনা কথা বেশি দিন থাকে না। কারণ, কথা বা শব্দের সমষ্টি বাতাস মাত্র। কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করলে তা বেশি দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। সামাজিক মানুষই আদর্শ নাগরিক। সমাজের রীতি নীতি ও আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারাই শিক্ষা।

(খ) যেসব বিষয়ের সাথে মানুষের সামাজিকও বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই বা যেসব বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অপারগতা শিক্ষা করা নির্থক।

(গ) Learning by doing অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা আহরণ। এ নীতির ভিত্তিতে শিশুকে হাতে-কলমে কিছু শেখার মাধ্যমে উপযুক্ততা লাভে সক্ষম করে তুলতে হবে। শিশুকে শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন না, তার জন্য কেবল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলবেন। সৃষ্টি পরিবেশে শিশু শিক্ষা লাভ করে, অনাগত ভবিষ্যতে তার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

(ঘ) সমগ্র মানব জীবনই একটি পরীক্ষা প্রণালী। জন ডিউইর মতে, বিভিন্ন পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা শিক্ষার বাস্তব লক্ষ্যে চলতে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

৩. জড়বাদ ঃ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনবার এবং সে শক্তি ও সম্পদকে ব্যক্তিও সমাজের নানাবিধ উন্নতি কর্মে বিনিয়োগ করবার লক্ষ্যে জড়বাদ দর্শন বিশ্বাসী। জড়বাদের শিক্ষাদর্শন হচ্ছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষ তার জীবনে লাঞ্ছিত, পরিবর্তন ও কল্যাণ সাধন করবে।

৪. প্রকৃতিবাদ ঃ প্রকৃতিবাদে বিশ্বজগতে যাবতীয় বিষয়কে প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা হয়। এমতবাদ অনুসারে (১) মহাবিশ্বে যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, (২) মহাবিশ্বের যাবতীয় ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে; (৩) বস্তু যত প্রকার পরিবর্তন বা রুপান্তর হয় তা প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়। মোটকথা, এ মতবাদে একমাত্র প্রাকৃতিকেই চরমও মৌল সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্থান নেই। এ মতবাদের প্রবর্তক জ্যাঁ জ্যাক রুশো।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক মতবাদের শিক্ষাদর্শন হচ্ছে—

(ক) প্রকৃতির সাথে শিশু শিক্ষার সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রাকৃতিক উপায়ে ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে প্রকৃতির নিকট হতে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এটাই হবে তার মেধা বিকাশের উত্তম পথ।

(খ) শিশুর আচরণ, চিন্তা, প্রবণতা প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করবে। এক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-বিধান থাকবে না।

(গ) শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশু সক্রিয়। খেলাধুলার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) শিশুর উপর কৃত্রিম শৃংখলা আরোপ সমীচীন নয়। তার ভেতর স্বাভাবিকভাবে শৃংখলাবোধ জাগ্রত হবে।

৫. প্রয়োগবাদ ঃ আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য যে দার্শনিক মতবাদটি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে তা হচ্ছে প্রয়োগবাদ। প্রয়োগবাদ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে—

একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। সভ্য মানুষের তৈরি। খাঁটি বা চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। সত্য পরিবর্তনশীলও কথা ফলের উপর নির্ভর করে। এ মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই।

প্রয়োগবাদের শিক্ষা দর্শন হচ্ছে—

(ক) আধুনিক শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রচলন প্রয়োগবাদের অবদান। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিও সমাজ উভয়ের চাহিদাকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

(খ) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশেরই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে এ দর্শনে বিবেচনা করা হয়।

(গ) আচরণ ও শিক্ষা লাভের দিক থেকে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং তার ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

(ঘ) শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। অভিজ্ঞতার পূর্ণগঠনই শিক্ষার সত্যিকারের রূপ।

(ঙ) বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য কাজেই সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় নিবিড়ভাবে জড়িত।

(গ) ইসলামি শিক্ষা দর্শন

শিক্ষার স্বরূপ রুপায়নে ইসলামি শিক্ষা দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের যেসব বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে সেগুলি হচ্ছে—

১. ইসলাম সম্পর্কে ধারণা।
২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।
৩. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি।
৪. আবুদ মাবুদের সম্পর্ক।
৫. তৌহিদ ও শিরক।

www.pathagar.com

৬. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

৭. ইসলামের বিদ্যা অর্জন।

১. ইসলাম সম্পর্কে ধারণা ঃ ইসলামি মতবাদের চরম সত্যও পরম সত্তা হলেন পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর উপর বিশ্বাসই ইসলামের মূলনীতি। ইসলাম দর্শন মতে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, তিনি একমাত্র উপাসনাযোগ্য, তিনি সকলের প্রতিপালক এবং তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঃ আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। আসমান জমিনের সার্বভৌমত্ব তাঁর হাতে। তাঁর সার্বভৌমত্ব আস্থা স্থাপনের অর্থ হচ্ছে তাঁর আদেশ ও নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে নেয়া এবং কথাও কাজে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বাণীতে উল্লেখ আছে। "আমি একাগ্র মনে সরল বিশ্বাস সেই মহান সত্তার দিকে নির্বিষ্ট হলাম, যিনি আকাশ-পাতাল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আর মুশরিকদের সামিল নই।" *(আল-কোরআন)*

৩. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ঃ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিনিধি হিসেবে এবং পৃথিবীতে তাঁর হুকুমে দ্বীন কায়েম করতে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল কোরআনে বলেছেন, "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলিফা সৃষ্টি করেছি।" তিনি আরো বলেন, "আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি সেই দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করছি তোমাকে যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা, ঈশাকে, তা এই যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে মতভেদ কর না।" *(আল-কোরআন)*

৪. আবুদ-মাবুদের সম্পর্ক ঃ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা প্রকৃতি জগতের প্রকৃতির নিখুঁত বিন্যাস, মহাশূন্যে উদয়-অস্তরত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি এক মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই মহাশক্তি হলো স্বর্গ, মর্ত, ও আকাশ-পাতালের স্রষ্টা ও পরিচালক আল্লাহ। আল্লাহ হচ্ছেন (মাবুদ) এবং মানুষ হচ্ছে তাঁর দাস (আবুদ)। সুতরাং সেই মহাশক্তির কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা মানুষের ধর্ম। এই হলো ইসলামি দর্শনের মূল কথা।

৫. তৌহিদ ও শিরক ঃ আল্লাহর যে শরীক নেই-এই মতবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকে বলে তৌহিদ। তৌহিদবাদ সকল সুখ-শান্তির উৎস। তৌহিদের বিপরীত অবস্থা হলো শিরক। তৌহিদের সঙ্গে যেমন ন্যায়পরায়ণতা জড়িত, শিরকের সঙ্গে তেমনি স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতা জড়িত। তৌহিদে বিশ্বাসী হৃদয়ে সকল জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহ সমস্ত গুণের আধার। তার ওই সকল গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্যে মানুষকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

৬. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান ঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অন্যান্য ধর্মের মত কতগুলো রীতি নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। তাই আল্লাহর নির্দেশিত পথে যে কোন কাজ সমাধা করা ইবাদতের অর্ন্তভুক্ত। একজন মুসলমান নামাজের মোনাজাতে বলে থাকেনঃ হে প্রভু আমাকে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল দাও। ইসলাম দর্শনে দ্বীন ও দুনিয়ার একটি সুখকর সমন্বয় সাধন করতে করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

৭। ইসলামে বিদ্যাঅর্জন ঃ ইসলাম বিদ্যাঅর্জনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েছে। কেননা বিদ্যা অর্জন আল্লাহকে চেনার একমাত্র উপায়। তাই আল্লাহ সর্বপ্রথম বাণী যা তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ করে ছিলেন তাহলো "পাঠ কর, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটরক্ত থেকে। পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" *(আল-কোরআন)*

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে বিশ্বের যেকোন ধর্মের চেয়ে ইসলাম শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অসংখ্য বাণী লিপিবদ্ধ আছে।

(ঘ) কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ

পৃথিবীতে যেসব জ্ঞানী ও গুণীজন তাদের প্রতিভাকে মানব কল্যাণার্থে ব্যয় করে গেছেন এবং মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গেছেন। রেখে গেছেন তাদের প্রভিতার উজ্জল দৃষ্টান্ত তারাই দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ নামে পরিচিত। তারা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জ্ঞানও বিদ্যাশক্তি তাদের চির অমর করে রেখেছে। এসব বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে কতিপয় দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের কথা তুলে ধরা হলো—

১। পিথাগোরাস (৫৮২-৫০৭ খ্রী: পূর্ব)

পিথাগোরাস প্রাচীন গ্রীসের পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের অন্তগর্ত সামোস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণে তিনি আজীবন নানা মহাদেশে পরিভ্রমণ করেছেন। পরম ধার্মিক ও মহাজ্ঞানী পিথাগোরাস দক্ষিণ ইটালির ক্রেসেনার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি মৌখিক অনুশীলন এবং ব্যবহারিক কাজকর্ম দুভাবেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর মতে, গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নের উপরই জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়। এই ধারণা নিয়ে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, সংগীত, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সংখ্যাকে সম্পৃক্ত করেই শিক্ষাদানে অভিনবত্ব এনেছিলেন। পিথাগোরাসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ছিল প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতদের মিলন কেন্দ্র।

২. সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি: পূর্ব)

বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা-দার্শনিক সক্রেটিস খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭০ সালে এথেন্সে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে এথেন্সেই মৃত্যুবরণ করেন। যুক্তি সিদ্ধ (Dialectic) মতবাদের প্রবর্তক হিসাবে সক্রেটিসের নাম শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে কোন কিছু শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। দার্শনিক শিক্ষাবিদ সক্রেটিস এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষকে তার বিশ্বাসের সঠিক লক্ষ্যে পৌছতে এবং কতকগুলো সুচতুর প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে তার চিন্তাশক্তির বিকাশে সাহায্য করতেন যাতে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু গ্রহণ করতে না হয়।

www.pathagar.com

সক্রেটিসের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল জিজ্ঞাসা, যা এই একবিংশ শতকের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ও একটি বিশেষ কৌশল বা কলা হিসাবে সবদেশে স্বীকৃত। শিশু-কিশোর তরুণের আগ্রহের দ্বীপকে প্রশ্নের সলিতার মুখে উদ্দীপ্ত করে তোলার নৈপুণ্য একজন বিদগ্ধ শিল্পীর কাজ। বক্তৃতা নয়, বাধ্যকতা নয়, নিয়ম গীতির কাঠিন্য নয় প্রশ্নোত্তরের অবকাশ দিয়ে ছাত্রের কল্পনা, ধারণা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির ক্রমাগত মার্জনার ও অনুশীলনে তার স্বচ্ছ মনের ফলকে যে সত্য তথ্যটি প্রতিভাত হতো শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি সেটি। এই অভিজ্ঞতাই ছাত্রের জীবনে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করতে সাহায্য করত।

৩. প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রী: পূর্ব)

ভাববাদী শিক্ষাবিদ প্লেটো খ্রীস্টপূর্ব ৪২৭ সালে এথেন্সে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে এথেন্সেই মারা যান। প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শনে তাঁর শিক্ষক সক্রেটিস কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোর শিক্ষা মতবাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে তাঁর বিখ্যাত বই প্রজাতন্ত্র (The Republic) এবং আইন (The low) গ্রন্থ। প্রজাতন্ত্র তাঁর জীবনের প্রথমদিকে রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আদর্শ মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছন। প্লেটোর আইন গ্রন্থদ্বয় শেষজীবন পর্যন্ত রচিত। এই গ্রন্থের সপ্তমখণ্ডে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে।

প্লেটো বলেছেন যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি মানসিক প্রশিক্ষণ যেখানে বয়স্ক লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা হতে অর্জিত সুন্দর জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন করেন এবং সে জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। প্লেটো তাঁর, "প্রজাতন্ত্র গ্রন্থে তিন ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন।

১। **প্রাথমিক শিক্ষা ঃ** এ শিক্ষা স্তরের উদ্দেশ্য হবে শিশুর মনে সৌন্দর্য চেতনা এবং নীতিবোধের উন্মেষ ঘটানো। এর বয়সসীমা (৬ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত)।

২। **মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** চরিত্র গঠনই এ শিক্ষা স্তরের মূল লক্ষ্য হবে। এ পর্যায় ছাত্রদের শৃংখলা জ্ঞান, কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেয়া, বুদ্ধি ও চিন্তার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি এবং জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা। এ সময় তিনি কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং এ সময় পরপর কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে তাদের সামর্থ্য, অভিরুচি ও অনুরাগের স্তর নির্ধারণ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হতো। এর বয়সসীমা (১৮-৩০ বছর পর্যন্ত)।

৩। **উচ্চ শিক্ষা ঃ** জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় জটিল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষণামূলক আলোচনা এবং তাদের সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করা। এসময় পরীক্ষাগুলোতে কৃতকার্য হলে তাকে বলা হত উত্তম শিক্ষক ও উত্তম দার্শনিক। এর বয়সসীমা (৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত)।

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে রুপায়িত করার জন্য প্লেটো তিন ধরনের বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। (১) প্রাথমিক জ্ঞানের উপযোগী প্রতিষ্ঠান। (২) শরীরবিদ্যা, সময় বিদ্যা, সংগীত, সাহিত্য, গণিত, পৌরনীতি, আইন শাস্ত্র, গবেষণা ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। এবং (৩) নির্বাচিত ধীমান ছাত্রদের রাষ্ট্রনায়ক তৈরি করার জন্য বিজ্ঞান,

www.pathagar.com

কারিগরি বিদ্যা, দর্শন, আইন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিদ্যা, উচ্চতর জ্ঞানও অভিজ্ঞতা দানের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব দানের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর পর্যন্ত উত্তম দার্শনিক হবার মতো শিক্ষা দেওয়া হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্লেটো শিক্ষিত সচেতন নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে এক নবতর সমাজ রচনার লক্ষ্যেই শিক্ষানীতির রুপ কল্পটি প্রস্তুত করেছিলেন।

৪. এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি: পূর্ব)

বিশ্ব বরেণ্য শিক্ষা দার্শনিক এরিষ্টটল খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে এবং সেখানেই ৩২২ খ্রী: পূর্বে পরলোকগমন করেন।

সক্রেটিস প্লেটো-এরিস্টটল যেন একই মালায় গাঁথা আলোকবৃত্ত। সক্রেটিস জ্যোতিষ্ক, প্লেটো ও এরিস্টটল দুটি-উজ্জল নক্ষত্র। শিক্ষক গোষ্ঠীর পুরোধা সক্রেটিসের সর্বোত্তম ছাত্র প্লেটো এবং শিক্ষাদর্শনের অধিনায়ক প্লেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র এরিষ্টটল। সুদীর্ঘ ১২ বছর এরিস্টটল ছিলেন প্লেটোর উৎসাহী ছাত্র এবং একাডেমীর নিষ্ঠাবান সহকর্মী। তারপর তিনি লাইসিয়ামে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করেন। তাঁর ধীমান ও শক্তিধর ছাত্র মহাবীর আলেকজাণ্ডার (৩৫৬-৩২৩ খ্রীঃ পূব) এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

এরিস্টটল তাঁর "পলিটিক্স" নামক গ্রন্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গরুপে বিশ্লেষণ করেন। গ্রীক্সের শিক্ষক ও দার্শনিক চিন্তাধারায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনে সার্থক এরিষ্টটলকে বলা হয় সব জ্ঞানীদের গুরু। তাঁর মতে, শিশুর সুপ্ত বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। নিজ পারিবারিক পরিবেশে শিশু পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে। ছয় বছর বয়সেই শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব নিবে রাষ্ট্র এবং এ শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলা, গান ও আঁকার মাধ্যমে লেখা পড়ার পাঠ শুরু হবে। শিশু-মানসে রুচি ও প্রবৃত্তির বৈষম্য-অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়েও বৈচিত্র থাকবে এবং শিশুকে তার প্রবণতাও প্রতিভা অনুযায়ী চরিত্র গঠনে সাহায্য করতে হবে। রাষ্ট্রীয় আদর্শকে রুপায়িত করতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সুখী সমাজ গঠন করতে শিক্ষার ভূমিকা যে ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ এ কথা এরিষ্টটল বার বার বলেছেন, তাঁর "পলিটিক্স" গ্রন্থে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুন্দর রুপরেখা তুলে ধরেছেন।

৬২ বছরের জীবনকালে এরিস্টটল তাঁর অন্যান্য কাজের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষা-দর্শন বর্তমানে ও শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা ধারার উৎস হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ও তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ক্রমের কাঠামো রচনার তিনি যে অবদান রেখে গেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ ও তার প্রভাব বিস্তার লক্ষণীয়।

৫. আবু ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রী:)

বিখ্যাত আরব দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ আবু-ইবন রুশদ স্পেনের কর্ডোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এরিষ্টটলের মতবাদে অনুরাগী রুশদ ছিলেন এক প্রখর প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ধর্ম, দর্শন, আইন, সাহিত্য, চিকিৎসা বহু বিদ্যার দক্ষও জ্ঞানী রুশদ

www.pathagar.com

এরিষ্টটলের রচনাবলীর অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করেন। প্লেটোর রিপাবলিকের ব্যাখ্যা ছাড়াও এই বিজ্ঞ মনীষী দর্শন, শিক্ষা, আইন, ব্যাকরণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বেশ-কয়েকটি পুস্তক ও রচনা করেন।

রুশদের মতে, বিশ্ব জগতের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। জগৎব্যাপী কার্যকরণের সমন্বয় আছে বলেই বিশ্বজগৎ এত সুশৃংখলার চলছে জীবনকেও এমনি সুশৃংখলায় গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলতেন, নিজেকে জানবার আগ্রহ যার নেই, সে বড়ই দুর্ভাগা। কেন না স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা তার নেই এবং এ জন্য শিক্ষার মর্যাদা সম্পর্কে সে অজ্ঞান। মানুষ অজ্ঞতার জন্যই ধর্মও দর্শনের মধ্যে সৃষ্টি করে বিরোধ। ধর্মের বিষয় সৎ, সত্য পথে চলা। অনুসন্ধিৎসা এবং সাধনা ছাড়া সত্যের পরিচয় লাভ করা দুঃসাধ্য। দর্শন এই সত্য সন্ধানের পথও পদ্ধতিকে সমান করে দেয়। পাশ্চাত্য দর্শনের তথা শিক্ষা দর্শনের ইতিহাসে রুশদের রচনাবলী নির্দেশক রুপে পরিগণিত।

৬. আবু নাসের আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রী:)

দর্শন, শিক্ষা ও গণিত সম্পর্কে নিজের মত বিশ্লেষণ করে যিনি সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁর নাম আবু নাসের আল ফারাবী। তিনি ৮৭০ খ্রি: ককেশিয়ায় ফারাব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফারাবীর মতে, মানুষের আত্মা স্রষ্টার এক মহান দান। বুদ্ধি মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের শ্রেষ্ঠপন্থা বিশ্বজুড়ে যে ঐক্য সূত্র বিদ্যমান, তার উপলব্ধি করা সাধনা সাপেক্ষ। শিক্ষাই মানুষকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহাত্মা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

৭. ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রী:)

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং সুচিকিৎসক ইবনে সিনা ইউরোপে আবিসিনা নামে পরিচিত। ইসলামি দর্শনের নীতি বিশ্লেষণে সুপণ্ডিত ইবনে সিনা ছিলেন মহাজ্ঞানী এরিস্টটলের দর্শনসূত্রের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকর। তাঁর রচিত দার্শনিক বিশ্বকোষ। "কিতাবুল সিকারা" এরিস্টটলের দর্শন সূত্রের প্রতিফলন খুব বেশি। ইবনে সিনা সত্যানুসন্ধানী ও মুক্তবুদ্ধির ধারক ছিলেন। তাঁর চিন্তা ধারার নির্বাস শিক্ষাতত্ত্বের মৌল ভিত্তি রচনার বিশেষ অবদান রেখেছে।

৮. জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রী:)

ইংরেজ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জনলক তাঁর একজন প্রিয় বন্ধুর পুত্রকে শিক্ষা সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়ে পত্রগুচ্ছ লিখেছেন, তার থট কনসার্নিং এডুকেশন (Thoughts concerning Education) গ্রন্থটি সেগুলিরই সংকলন। জন লকের মতে, জন্ম লগ্নে শিশুর মন থাকে স্বচ্ছ একটি শ্লেটের মতো। দিনে দিনে তাতে জ্ঞানও অভিজ্ঞতার বিচিত্র রেখা চিত্রিত হয়। সুতরাং শিশু শিক্ষায় পরিবেশ এবং কার্যক্রম হতে হবে নির্মল, সহজ এবং মুক্ত। এজন্য তিনি গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোর বক্তব্য রেখেছেন। কেননা, শৈশব থেকেই শিশুর লালন পালনের জন্য উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চরিত্র সুন্দর পুস্পমঞ্জসরূপে গড়ে উঠে। উপযুক্ত শিক্ষাই চিত্তে একধারে স্বাধীন ভাব-ভাবনা ও প্রয়োজনীয় সংযমের সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে এবং

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

৯. জ্যাঁ জ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রী:)

রুশো একজন ফরাসী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত। রুশো ১৭১২ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৭৮ সালে মারা যান। রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় "The Social contract" এবং "Emili" প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই গ্রন্থদ্বয় রুশোর শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা-বিস্তার সাক্ষ্য বহন করে।

প্রকৃতির কোলে ফিরে যাও। প্রবাদটি রুশোর নামের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। রুশো কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মূল সূর হচ্ছে, "The Child should be thought by the lows af Nature." অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ শিশু তার পরিবেশের মাধ্যমেই শিখে। রুশো শিক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্বের মূল নীতিগুলো হচ্ছে—

১. শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী। প্রকৃতি বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিশুর দেহ-মনের স্বাভাবিক শক্তি, সামর্থ, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি।

২. শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রকৃতিগত শক্তিগুলোর সুষম বিকাশের মাধ্যমেই শিক্ষা সংগঠিত হয়, শিক্ষক বা অন্য কোন বহিঃশক্তির চাপে অর্জিত হয় না।

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয় বরং শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ও দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।

৪. শিক্ষা প্রদানের আগে শিক্ষার্থীকে ভালভাবে নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্পর্কে জানতে হবে।

৫. শারীরিক সক্রিয়তা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যবস্থা শিক্ষা কর্মসূচিতে থাকতে হবে।

৬. পনের বছর পর্যন্ত শিশু কেবল প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করবে।

১০. ফেড্রারিক ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২ খ্রী:)

ফেড্রারিক ফ্রোয়েবেল ১৭৮২ সালে জার্মানিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৫২ সালে জার্মানিতেই মারা যান। শিক্ষার ইতিহাসে তিনি দার্শনিক শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত।

শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে ফেড্রারিক ফ্রোয়েবেল অনেক অবদান রেখে গেছেন যার মধ্যে "কিন্ডারগার্টেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্ডারগার্টেন একটি জার্মানি শব্দ যার বাংলা অর্থ "শিশুর বাগান।" বাগানের অগণিত চারার মতই মনে করতেন তিনি শিশুদেরকে। বাগানের চারাগাছকে পূর্ণরুপে আত্মবিকাশের দায়িত্ব মালী পালন করেন। তদ্রুপ শিক্ষককে পরিমিত যত্ন সহকারে, শিশুদেরকে লালন পালনের দায়িত্ব বহন করতে হবে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণই এই পদ্ধতির মূল কথা।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষামূলক গবেষণা পুস্তক "The Education of man" ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের মূল তত্ত্ব ছিল শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে

www.pathagar.com

সব পরিকল্পিত উপায়ে বিবর্তনধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাশ রাখা। শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রোয়েবেলের অবদান হচ্ছে—

১। এককের মতবাদই ছিল ফ্রোয়েবেলের মতবাদের মূলভিত্তি। তাঁর মতে, প্রতিটি বস্তু প্রথমত, তার নিজের কাছে এককের প্রতিচ্ছবি এবং একই সঙ্গে বৃহত্তর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের আওতাধীন বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান, শিল্পকলা, অংকনও ভাষা। পাঠ্যক্রমের আওতাধীন প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩। শিশুদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্যই তাদেরকে শিক্ষাদিতে হবে।

৪। শারিরীক প্রশিক্ষণকে শিক্ষার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ধরা হয়।

৫। তাঁর মতে, খেলা হচ্ছে একটা পবিত্র প্রক্রিয়া বা আধ্যাত্মিক কাজ যা শিশুকে আত্মোন্নতির, দিকে পরিচালিত করে।

৬। শিশু পবিত্র মানস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে সে অবাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জন করে। তাই শিশুর পিতা-মাতা ও শিক্ষকের কাজ হবে পরিবেশের নোংরা প্রভাব হতে শিশুকে মুক্ত রাখা।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি:).

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে পশ্চিম বঙ্গের জোড়াসাঁকো গ্রামে ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি হিসেবে বিশ্বে ও শিক্ষাজগতে সমাদর লাভ করেননি, তিনি শিক্ষক ও শিক্ষা-দার্শনিক হিসেবে ও সমাজের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গেছেন।

আমাদের বর্তমান স্কুলগুলো সত্যিকারের শিক্ষাদানও আদর্শ মানুষ তৈরির উপযোগী নয়, সে কথা তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে গেছেন "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে একটা কথা জেগে উঠেছিল। ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে যার নাম স্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব শক্তির শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অথচ ইহাই স্কুল। ইহার ঘরগুলো নির্মম, ইহার দেয়ালগুলো পাহাড়াওয়ালার মতো। ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই। ইহা খোপ ওয়ালা একটা বড় বাক্স; কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণের লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভাললাগা, মন্দলাগা বলিয়া একটা খুব মানবড় জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নিঃশেষে, নির্বাসিত।"

কবিগুরু শান্তি নিকেতন স্থান করেন শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতবাদকে রুপ দিতে। তিনি বলেছেন," শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কল মাত্র নহে। স্বতঃ উৎসায়িত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদের নীতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতি হচ্ছে :

www.pathagar.com

১. জন্মের প্রথম গ্রন্থ

নিয়ে আসে অলিখিত খাতা
দিনে দিনে পূর্ণ হয়
বাণীতে বাণীতে। (শেষ লেখা)

রবীন্দ্রনাশ ঠাকুরের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, শিশু জন্মের সময় মন থাকে একটি স্যাদা কাগজের ন্যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা শিক্ষার অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

২. বদ্ধ শ্রেণী কক্ষ প্রাণ ধর্মী চিত্তের সহজ বিকাশের জন্য বিরাট বাধা স্বরূপ।

৩. শিশুরা যাতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্য পরিমিত উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীরা নিজে চিন্তা করতে শিখবে, সন্ধান কার্য চালাবে এবং কর্তব্য কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করবে।

৫. শিক্ষার্থীরা যখন যেটুকু শিখবে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে শিখবে। এর ফলে শিক্ষা তার উপর চেপে বসবে না, শিক্ষার উপরই সে চেপে বসবে।

৬. আনন্দ সহকারে পড়তে পারলে শিশু পড়ার ক্ষমতা তার অজান্তেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার গ্রহণ ক্ষমতা, ধারণা শক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে চলে।

৭. চিন্তাশক্তি ও কল্পনা শক্তি দুটি-ই জীবনযাত্রাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৮. মনের গতি অনুসারে শিক্ষার পথ নির্দেশ করতে না পারলে তা কার্যকরী শিক্ষা হিসাবে অবহিত হতে পারে না।

৯. শিক্ষার একটি গুরুতর বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর আশানুরুপ ব্যবহারিক পরিবর্তন।

১০. জীবনের শুরুতে শিক্ষার্থীর মন ও চরিত্রকে গড়ে তুলতে উপদেশের উপর নির্ভর না করে তার জন্য অনুকূল অবস্থা, অনুকূল পরিবেশ ও অনুকূল নিয়ম গড়ে তোলা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন যুগে শিক্ষাব্যবস্থা

ভূমিকা

মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে কোন জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে ইতিহাস জানা। কোন জাতির ইতিহাস জানা না থাকলে সে জাতি যেমন উন্নতি লাভ করতে পারে না, তেমনি শিক্ষার ইতিহাস জানা না থাকলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন পূর্ণ হয় না এবং সে সাফল্য লাভ করতে পারে না। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ সিনকো বলেছেন, "ইতিহাসকে কখনো অস্বীকার করা যায় না, যারা করে তারা নির্বোধ।" ছাত্র জীবনে সফলতা অর্জনের অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে, শিক্ষা বিবর্তনের ইতিহাস জানা। উন্নত বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীরা এ সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞাত হয় অথচ বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষাজীবনের অপরিহার্য অংশ। সেই কথা চিন্তা করেই এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে তুলে ধরার বেশির ভাগই হলো।

ক. প্রাচীনযুগ

উপাদানের স্বল্পতার কারণে প্রাচীন কালে বাংলায় কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তার বর্ণনা দেওয়া, এমনকি সে সম্পর্কে একটি রুপরেখা প্রণয়ন করা খুবই কঠিন। তবে যেসব তথ্য হাতের কাছে আছে তার উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়।

প্রাচীনযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রকৃতি যথার্থভাবে নিরুপণ করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। সে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় সত্য; তবে প্রাপ্ত সূত্রে দিতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

বৈদিক আর্যরা প্রাচীন বাংলার জনগণকে ভাল চোখে দেখত না। তারা তাদেরকে দস্যু ও ম্লেপ বলে মনে করত। কিন্তু কালের স্রোত ধারার আর্যভাষা ও সংস্কৃতি বাংলার প্রবেশ করে, খুব সম্ভবত মৌর্য আমল থেকে।

ধারণা করা হয় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। তবে চেষ্টা বোধ হয় কয়েক শতাব্দী আগেই শুরু হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ছোট বড় শিক্ষায়তন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যায় ফা-হিয়েন তাম্রলিপিতে দুবছর অবস্থান করে, অধ্যায়ন ও পুঁথি নকল করেছিলেন। সপ্তম শতকে যখন হিউয়েন সাং কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরুপ, সমতট, তাম্রলিপি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আর ও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জনগণের জ্ঞান স্পৃহা

www.pathagar.com

ও জ্ঞান চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময়ে কজঙ্গলে ৬/৭ টি বৌদ্ধ বিহারে তিনশর উপর বৌদ্ধ শ্রমণ; পুণ্ড্রবর্ধনের ২০টি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ; সমতটে ৩০টি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দু'হাজারের উপরে; কর্ণসুবর্ণে ১০টি বিহারে একই সংখ্যক শ্রমণ ছিল। পুণ্ডবর্ধনের পো-সি-পো বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহার যে খুবই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলে হিউয়েন সাং-এর সাক্ষ্যই আর প্রমাণ।

নালন্দা মহাবিহার এর সঙ্গে ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীর বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ মহাবিহারের মহাচার্য শীলভদ্র ছিলেন বাঙ্গালি। তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের সন্তান এবং হিউয়েন সাং এর গুরু। তিনি সমস্ত শাস্ত্রে ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারের শ্রমণ সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। তবে এখানে যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ করা হতো তা নয়, বরং ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তগর্ত ছিল। এই বিহারগুলিতে বাস করতেন ব্রাহ্মণ আচার্য উপাধ্যার এবং অগণিত দেবপূজক দেবপূজকগণ যে শুধু ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রে চর্চা করতেন তা নয়, তারা নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ও করতেন। এভাবে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করে আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষার বীজ বপন করা হয় এবং শতাব্দীকালের মধ্যেই তা সুফল বয়ে আনে। সপ্তম শতাব্দীর লিপিগুলির অলঙ্কারময় কাব্যরীতিই তার প্রমাণ।

ব্যাকরণ চর্চায়, বাংলাদেশ অতি প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিং যেসব বিদ্যা অনুশীলন করার জন্য তাম্রলিপ্তি এনেছিলেন তার মধ্যে শব্দ বিদ্যা অন্যতম। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণিক চন্দ্র গোমী চান্দ্রব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা। তিনি সপ্তম শতাব্দী বা তার আগে কোন এক সময়ের লোক। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন ও তাঁর জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে। তিনি যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন তা নয়, তিনি তর্কবিদ্যায় ও পারদর্শী ছিলেন।

প্রাচীনকালে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায় ও বাংলাদেশ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। আগমশাস্ত্র গ্রহ গৌড় পাদকারিকা এ যুগেরই লেখা। কৌটিল্য ও গ্রীক ঐতিহাসিকবর্গ হতে শুরু করে হিউয়েন সাং পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হাতির লীলা ভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। তাই হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আলাদা একটি শাস্ত্রই গড়ে উঠেছিল এতদঞ্চলে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হত্যায়ুর্বেদ (গজ চিকিৎসা) খ্যাতি লাভ করে।

সপ্তম শতাব্দীতে যে অলঙ্কৃত কাব্যরীতির সূচনা হয়েছিল, তার পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় পাল আমলের গোড়ার দিকেই। সমসাময়িক লিপিমালা ও চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে বেদ, আগম, নীতি,

www.pathagar.com

জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সব কিছুরই চর্চা হত। এসব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বিদ্বজ্জন সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এ সব শাস্ত্র অনুশীলন করতেন। কিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের চর্চা হতো সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজেদের গৃহে কিংবা বড় বড় মন্দিরকে আশ্রয় করে ছোট বড় চতুষ্পাঠী গড়ে তুলতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী গ্রহণ করতেন। বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্র একজনের নিকট শিক্ষা শেষ করে অন্য শাস্ত্র পাঠ করার জন্য অন্য আচার্যের কাছে যেতেন। কোন বিশেষ শাস্ত্রে কেউ পারদর্শী হতে চাইলে তার জন্য বিশেষজ্ঞ আচার্য পাওয়া যেত। বাঙালি ছাত্ররা অনেক সময় পড়াশোনার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেতেন। ধর্মপ্রচার কিংবা বিদ্যাদানের জন্য বাঙালি আচার্যগণ অনেক সময় বাংলার বাইরে যেতেন। অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা যারা করতেন রাজা মহারাজা ও সামন্ত মহা সামন্তগণ তাদের অর্থদান ভূমিদান করতেন। পণ্ডিত, কবি আচার্য প্রভৃতিদেরকে মাঝে মাঝে তারা পুরস্কৃত করতেন।

এ সময়ে পণ্ডিতগণ সংস্কৃতি ভাষাতেই তাদের গ্রন্থাদি রচনা করতেন। কিন্তু এভাষা সর্ব সাধারণের ছিল না বলে পালযুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার শিক্ষিত উচ্চ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সেনযুগে তো সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চা, কাব্যচর্চা; জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সুবর্ণ যুগ। তাই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ না করলেও শিক্ষার প্রসারই বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চার পথ সুগম করেছিল। মধ্যযুগের টোল পাঠশালারই কোন আদি সংস্করণ প্রাচীনযুগে বিদ্যমান ছিল। তবে গুরুগৃহে, আশ্রমে বা বৌদ্ধ বিহারেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম চর্চার, পাশাপাশি পার্থিব বিষয়াদির যে চর্চা হতো; তা প্রাচীন যুগের প্রাপ্ত গ্রন্থরাজি থেকেই প্রমাণিত হয়। তবে এসব গ্রন্থাদিতে শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য নেই বললেই চলে।

খ. মধ্যযুগ

বাংলার মুসলমান সুলতানগণ তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক বা উচ্চতর সব রকম শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শাসক, সুফী, উলামা, অভিজাতবর্গ, গোষ্ঠীপ্রদান এবং জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ সকলেরই অবদান রয়েছে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামি সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। সে সময় ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন কাজে নির্দেশনা দিতেন। শাসকগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এসব ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ভূমিদান করতেন। অবস্থাপন্ন লোকেরা এঁদেরকে গৃহশিক্ষক নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের এলাকার অভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় রীতি নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সে কারণে দুটি প্রদান ধর্মীয় সম্প্রদায়-হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথক দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

www.pathagar.com

মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মকতব ও মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল। মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেকগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আরবি ভাষাকে উৎসাহ করা হতো। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও আইন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হতো। তাই, স্বদেশী ভাষার এ বিদ্যাগুলিতে কদাচিৎ মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। তাই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হিন্দু মুসলমান উভয় ফারসি ভাষা শিখতেন।

গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। এসব স্থানে দেশ বিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলমান শাসকগণ স্থানীয় প্রতিভাবানদের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে ও প্রথিত যশা ব্যক্তিদেরকে তাদের দরবারে আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতেন না। পাঠশালার অনুকরণে মকতবসমূহ গড়ে উঠত যেখানে মুসলিম ছাত্রদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতো।

মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটত। নবদ্বীপ ব্যতীত সপ্তগ্রাম, সিলেট এবং চট্টগ্রামে ও সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য এসব স্থানে সমবেত হতেন।

এভাবে মধ্যযুগীয় বাংলার যে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল, তা মুসলিম শাসনের পর থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

গ. উপনিবেশিক যুগ

ইংলিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকে তাদের দায়িত্ব বা আইনগত বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে মনে করত না।

১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নাবায়নকালে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হলে এ ধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুদান বিতরণের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮২৩ সালে কলকাতার একটি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন "গঠিত হয়। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে মতামত প্রদান করে এবং সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার জন্য এর তহবিল ব্যয় করে। ইংরেজি গ্রন্থসমূহ প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্য এ তহবিলের একটি অংশ ব্যয় হয় এবং ইংরেজি ভাষার গ্রন্থ রচনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়।

এ সময় শিক্ষা খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে এক নতুন অনুপ্রেরণা লাভ করে। প্রাথমিক মিশনারিদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের শীঘ্রই দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে যে, ধর্মান্তরিত করণের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসাবে অবশ্যই স্কুল চালু করতে হবে। ড্যানিশ মিশনারিগণ সত্যিই ভাগ্যবান ছিলেন (১৭০৬-৯২)। কারণ, তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদয় তত্ত্বাবধান ও সহানুভূতিপূর্ণ সহায়তা লাভ করেছিলেন। বাংলায়

www.pathagar.com

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল এবং তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন, যদি না শ্রীরামপুর ও চুঁচড়ার ওলন্দাজগণ তাদেরকে রক্ষা না করতেন। এদের কার্যকলাপ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে পাঠদান, একটি বিস্তারিত পাঠ্যক্রম এবং সুস্পষ্ট শ্রেণী প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। দেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বই পুস্তক ছাপিয়ে মিশনারিগণ ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নয়নের প্রেরণা যোগায়। দেশীয় ভাষাসমূহ চর্চার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিষয়সমূহের শিক্ষাদান চলতে থাকে। এভাবেই ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম হয়।

মিশনারিগণ ছাড়াও রাজা রামমোহন রায় এর মতো কিছু জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় ছিলেন যাঁরা উপলব্ধি করে ছিলেন যে, ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষাদিতেই হবে। গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক স্মারক লিপিতে তিনি জোরালো সুপারিশ করেন যে, কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাতিল করতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের উচিত গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা এবং অন্যান্য উপকারী বিজ্ঞান বিষয়সমূহ নিয়ে অধিকতর উদার ও জ্ঞান দীপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

জেনারেল কমিটির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের উত্তপ্ত বিতর্কই বিষয়টির প্রকৃতিতে একটি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। অধিকতর সংস্কার মনোভাব তরুণ সদস্যগণ প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার নীতি সম্পর্কে আপত্তি জানান এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত ম্যাকলের বিবরণী দ্বারা-ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে এ বিতর্ক সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর সুপারিশ মালা বেন্টিঙ্ক এর অনুমোদন লাভ করে। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পেছনে অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণ বেশ সহায়ক ছিল। উদাহরণস্বরূপ ছাপাখানা স্বাধীনতা আইন (১৮৩৫) ইংরেজি ভাষায় বইয়ের মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্রাপ্যতাকে উৎসাহিত করে এবং এভাবে পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কয়েক বছর পরে সরকারি দলিল পত্রের ভাষা হিসাবে ফারসির বিলুপ্তি এবং এর পরিবর্তে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার প্রবর্তন ও উক্ত প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। চূড়ান্তভাবে, সকল সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর হার্ডিঞ্জ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদাকে জোরদার করে তোলে।

১৮৫৪ সালে চার্লস উড এর "এডুকেশন ডেসপ্যাচ' প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি, ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও "গ্রান্টস-ইন-এইড" প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয় এবং এ প্রতিবেদন সরকারের ভবিষ্যত শিক্ষা নীতির মূল উপাদান উপস্থাপন করে। এর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের শিক্ষাদানের ভূমিকা পালন করা হতে দূরে ছিল। এ সময়ে তাদের কার্যক্রম পরীক্ষা চালনা, অধিভুক্তির জন্য অনুমোদন এবং ডিগ্রী ও সনদপত্র প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা, কলেজ শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণে তেমন সুফল বয়ে না আনলেও নতুন শিক্ষায়াত্র শিক্ষিতগণ বিশেষ পাণ্ডত্য প্রদর্শন করেন।

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলা ও অযত্নের শিকার হয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা যথার্থ তত্ত্বাধানের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারি উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতায় অপরিকল্পিতভাবে বহু উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার কেন্দ্র না হয়ে শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানে (Coaching Institutions) পরিণত হয়েছে। সরকার অবাধ নীতি (Laissez faire) গ্রহণ করার এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল অতি সামান্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কতিপয় মুসলিম সংস্থা এবং অন্যান্য উপদলসমূহ ব্রিটিশদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তারা এর পরিবর্তে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক আন্তরিক প্রচেষ্টার দাবি জানায়। ১৮৯৮ সালে ভাই সময়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লর্ড কার্জন যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি অনতিবিলম্বে জনগণের অনুভূতি উপলব্ধি করেন এবং দেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ পরীক্ষার পর কার্জন দুর্বল দিকগুলি সুদৃঢ় করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলির প্রতি প্রদেশসমূহের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

দেশে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পক্ষে কার্জন ১৯০২ সালে "ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের আকার ছোট করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলি কেবল পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে নয়, শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও কাজ করবে। উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিভুক্ত কলেজসমূহে মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য চাপ প্রদান করবে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এর পর বাংলায় এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্বভাবতই এই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কার্জনের শিক্ষা সংস্কার এমন এক সময়ে শুরু হয়। যখন একে অবশ্যমভাবীরূপে শিক্ষার আমলাতান্ত্রিকীকরণের সাথে সমার্থক বিবেচনা করা হয়। পাঁচ বছরের আদম্য প্রচেষ্টার পর ও কার্জন জনগণকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হন।

কার্জন এ উত্তরাধিকারিগণ মূল উদ্দেশ্যকে নির্বিঘ্ন রেখে শিক্ষানীতির কিছুটা সংশোধন করেন। কার্জনের সংস্কারের প্রতি বিরুপ জনমত সত্ত্বে ও তাঁর শাসনামলে শিক্ষার উন্নতি উল্লেখযোগ্যভাবে সাধিত হয়।

১৯১০ এবং ১৯১৩ এর মধ্যে গোখেল সরকারকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করার জন্য সাহসিকতার সাথে জোর প্রচেষ্টা চালান। বোম্বাই আইন পরিষদ পৌর এলাকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বিটল ভাই জে-প্যাটেল এর প্রস্তাবিত বিল গ্রহণে করে, যা পরিণামে ১৯১৮ সালে বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষা আইনে পরিণত হয় এবং তা পরবর্তী সময়ে প্রণীত আইনের আদর্শ হিসেবে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল।

www.pathagar.com

১৯১৯ সালের আইনে শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত হয় এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে এর দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপর অর্পিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে, শিক্ষানীতি ও প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং চূড়ান্তভাবে জনগণের নিকট দায়ী শিক্ষামন্ত্রীর উপর অর্পিত হয়। ইউরোপীয় রীতির শিক্ষা সংরক্ষিত বিষয় হিসাবে রাখা হলেও এটি ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রীদের অবস্থান আরো জোরদার করে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন, পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং স্ত্রী শিক্ষা ও অপরাপর অসুবিধা ভোগী শ্রেণীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ কর্তৃক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণয়ন ছিল ১৯২১ এবং ১৯৪৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক বৈশিষ্ট্য। এই আইনসমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজ নিজ প্রক্রিয়ার ভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা প্রদান করে।

(১৯১৬-১৭ হতে ১৯৪৬-৪৭) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময়ে সমগ্র একক ও অধিভুক্ত ধরনের ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশবিশেষ। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক অঙ্গের গণতান্ত্রয়ণ ঘটে। নতুন নতুন অনুষদ, পাঠক্রম ও গবেষণা প্রকল্পগুলি চালু হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে মহাবিদ্যালয় এবং তালিকাভুক্ত ছাত্রদের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের শারিরীক শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদনকারী কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। আন্তবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ গঠন এবং আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকলাপের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাঙ্গনের জীবনে নতুন গতি সংযোজিত হয়।

ঘ. ১৯৪৭ পরবর্তী থেকে স্বাধীনতা পূর্বযুগ

ব্রিটিশ শাসন-থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম লাভ করে যথাক্রমে ১৪ও ১৫ ই. আগস্ট, ১৯৪৭। এই সালটি এক জল বিভাজিকা, যেমন রাজনৈতিকভাবে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও। এরপর পূর্বপাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কার্যক্রম যে পথে অগ্রসর হয়, তা ভারতীয় ধারা থেকে স্বতন্ত্র।

ব্রিটিশ শাসন রেখে গিয়েছিল একটি উত্তরাধিকার। সংক্ষেপে, পশ্চিমি ধারায় ১৮৩৫ এর ভারতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে সকলের প্রস্তাবানুযায়ী (Mecaulay's minute, 1835) শিক্ষার মাধ্যমে স্থির হয়েছিল ইংরেজি, আর শিক্ষার বিষয়গুলি এসেছিল পশ্চিমের উদারনৈতিক শিক্ষার বিবিধ বিদ্যা থেকে। শিক্ষার গৃহীত হয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমাধিকারের নীতি। সনাতন প্রাচ্যবিদ্যা ভিত্তিক শিক্ষার জন্য সরকার কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবে না, এদের দায়িত্ব এরাই বহন ও পালন করবে।

www.pathagar.com

সরকারের সর্বশেষ দৃষ্টি ছিল উচ্চ শিক্ষার উপর, ভাষা হয়েছিল, সুসংগঠিত উচ্চ শিক্ষার প্রভাব পড়বে নিম্নতর মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরসমূহে।

১৯৪৭ সালের পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণত ভাবে সেকালে নির্দেশিত ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিটি কমিশন দ্বারা সমর্পিত ব্রিটিশ নীতির প্রতিফলনই দেখা যায়। সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট (১৯৪৪), যা পুরোপুরি সরকারি ব্যবস্থাপনার এক নতুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল, ঐ সময়ে পাকিস্তানের অংশে পরিণত বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হলো না। একে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছিল ভারত, পাকিস্তান দেয়নি। ইতোধ্যে শিক্ষা পরিণত হয়েছে প্রাদেশিক বিষয়ে, করাচি, পরে ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার দূর থেকে নজরদারি করছে। মাঝে-মধ্যে যে হস্তক্ষেপ করেছে তার মধ্যে সদিচ্ছায় প্রকাশ যেমন ছিল, আবার অজ্ঞতা-প্রসূত ও কুদল প্রদায়ী হস্তক্ষেপ ও কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে।

স্বাধীনতা নামের পর পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকার স্কুল পর্যায়ে একটি নতুন পাঠক্রম প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রবীণ রাজনীতিক ও ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাওলানা আকরম খান এর একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। কমিটির সুপারিশকৃত প্রাথমিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে। ধর্মশিক্ষা থাকবে তবে তা হবে মাতৃভাষা বাংলা ভিত্তিক। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল এক কথায় দুঃখজনক। দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ১৯২০ সালের আইনে যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল, তা কেড়ে নেওয়া হলো। সরকারকে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এর মধ্যে উপাচার্যের নিয়োগ ও ছিল এক নতুন ও ব্যাপক ক্ষমতা, যা আর ও দুঃখজনক। বহু-সংখ্যক কলেজ, কিছু সরকারি, অধিকাংশ বেসরকারি, সবই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিল বিশৃংখলা।

১৯৪৭ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতি এরকম উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ সরকারি অর্থানুকুলে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিচের স্তরে, কলেজসমূহ ও প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুলসমূহ নিয়ে একটি বেসরকারি সেক্টর। এর ফলে শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সরকারের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার যেভাবে এই চাহিদায় সাড়া দিয়েছে, তা কখন ও যদিও বা সঠিক হয়েছে, অন্য সময়ে তা আবার হয়ওনি। কখন ও লক্ষ্যমাত্রা বেঁচে দেওয়া হয়েছে । লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে কিন্তু সকল ব্যর্থতার পরও এই প্রদেশে, পরবর্তীকালের বাংলাদেশে রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, তা হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাবাহিক অগ্রগতি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডে, পূর্ব পাকিস্তানে যে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রা শুরু, তার আদিপর্ব ছিল দূর, অতীতে, উনিশ শতকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত সকল কলেজে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত পাঠক্রম অনুসৃত হয়েছে। ছাত্ররা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত পরীক্ষার বসেছে এবং তার দেওয়া ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় যে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা পৌরসভার সীমানার মধ্যে।

www.pathagar.com

এর বাইরে সারা দেশের সম্পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাই যুক্ত ছিল যে বৃহত্তর ব্যবস্থার সঙ্গে, তার শীর্ষ অবস্থানে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশ বিভাগের কারণে এই অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারির, ব্যাপক ভূমিকা বর্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। ঢাকার সমস্যা ছিল অনেক। জন্ম থেকেই ঢাকা একটি এককেন্দ্রিক ও শিক্ষাপ্রদায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় দিয়ে চলেছে। এর দূরবর্তী মডেল ছিল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ। এর আবাসিক হলগুলি ছিল অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কলেজের অনুকৃতি। এর ৩ বছর ব্যাপী অনার্স কোর্স ও ওই দুটি মডেল থেকে ধার করা। এর টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাও ছিল ওদের প্রচলিত টিউটোরিয়ালের ছকে তৈরি। সংক্ষেপে, শিক্ষাগত ও কাঠামোগত, উভয়তেই, অর্ধশতাধিক বছর পূর্বেকার লন্ডনের মডেলের গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। এখন ঢাকার সমস্যা হলো দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা। বাস্তব বিবেচনায় কলেজগুলিকে তাদের পূর্ব প্রচলিত কোর্স নিয়ে চলতে দেওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আর কোন বিকল্প পন্থা ছিল না। কলেজে বজায় রইল ২ বছর মেয়াদী পাস ও অনার্স কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল রইল ৩ বছর মেয়াদী অর্নাস কোর্স।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে, রাজশাহী শহরে; তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ সালে, চট্টগ্রামে, শহর থেকে কিছুটা দূরে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকার দৃষ্টান্তে ৩ বছরের অনার্স ও ১ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স গ্রহণ করে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কলকাতার ২ বছরের অনার্সকে ৩ বছরে উন্নীত করে অন্তত অনার্স ধারাকে এক জায়গায় মিলাতে সচেষ্ট হয় যার ফলে দারুণ চাপ পড়ে সেই কলেজগুলির উপর, যারা দীর্ঘকাল কলকাতার অধীনে ও পরবর্তীতে কিছুকাল ঢাকার অধীনে ২ বছরের অনার্স কোর্স চালু রেখেছিল। এই চাপের কারণে কোন কলেজ অনার্স কোর্স বন্ধ করে দেয়, যাত্রা চালু রাখে তারা বেসামাল হয়ে পড়ে, তবে হাল ছাড়ে না।

পাকিস্তান পর্বের (১৯৪৭-৭০) শেষের দিকে প্রদেশে আর ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় যাতা শুরু করে, ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১; ঢাকায় প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) (১৯৬২) এটি সম্পূর্ণ নতুন নয়; পূর্বতন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নতুন রুপ; ঢাকার অধুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০)।

আইয়ুব শাসনের দশকে দুটি কমিশন ঃ কমিশন অব ন্যাশনাল এডুকেশন (১৯৫৯) ও কমিশন অনস্টুডেন্ট প্রবলেমস এ্যাণ্ড ওয়েল দেওয়ার (১৯৬৪-৬৬), বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছিল। প্রথমটি ছিল সামরিক শাসন-সুলভ সংস্কার চিন্তাভাবনা উৎসাহের ফলশ্রুতি। শরীফ কমিশন (CNE-এর সর্বাধিক প্রচলিত নাম) রিপোর্টি শিক্ষার জন্য বরাদ্ধ ছিল ৩৬ পৃষ্ঠা। আর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র ৬ পৃষ্ঠা।

পূর্ব পাকিস্তানে বহুলভাবে নিন্দিত হলেও CNE উচ্চ শিক্ষার এই বিষয়গুলির উপর কিছু প্রণিধানযোগ্য কণা বলেছে ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট পর্যায় পরিচয়ে উচ্চশিক্ষা, যা ইন্টার মিডিয়েটের ঝামেলামুক্ত; ডিগ্রীপাস ও অনার্সের মেয়াদ ৩ বছরের বর্ধিতকরণ; ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও সে উদ্দেশ্যে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব মডান ল্যাংগুয়েজস গঠন; পরীক্ষা ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন; গবেষণা; শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ ও পদোন্নয়ন; ছাত্র কল্যাণ ও শৃংখলা, বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কাঠামো। এরই পরিণতি হিসাবে আসে ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সসমূহ (১৯৬১) ও ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বাভাস।

CNE রিপোর্টটি সুলিখিত। এর একটা অতি, ঢালাও মন্তব্যের, প্রবণতা, মন্তব্যের সমর্থনে তথ্য উপাও পরিবেশনে ব্যর্থতা। এটি প্রকাশের পর এর বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; (i) ডিগ্রী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট অংশ বিচ্ছিন্ন করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সরকারি কলেজ দিয়ে; (ii) ৩ বছর মেয়াদী পাস কোর্স প্রবর্তিত হয়, যার মধ্যে ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপায়; (ii) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় আইন রদ করে সে স্থানে নতুন অর্ডিন্যান্স প্রবর্তিত হয় (১৯৬১)।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষটি মাত্র ১৭দিন স্থায়ী হলেও এর ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠে। তাসখন্দ চুক্তি সাক্ষর ও যুদ্ধ বিরতির পর সারা দেশে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই খণ্ডেই ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা করায়ও হয় জেনালে ইয়াহিয়ার ও কিছুদিনের জন্য ফিরে আসে রাজনৈতিক সুস্থিরতা। একজনের এক ভোট, এই ভিত্তিতে দেশ যখন অপেক্ষা করছে সাধারণ নির্বাচনের। তখনই এয়ার ভাইস-মার্শাল নূরখানকে দেয়া হলো- একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব।

নয়া শিক্ষানীতি (The New Educational Palicy, 1969) ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট, ইতিবাচক চিন্তায় সমৃদ্ধ ও এরই মধ্যে ছিল একটি সংস্কারমূলক বিশ্ববিদ্যালয় আইনের রুপরেখা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ সিনেটের পুনর্বাসন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন যে NEP কেবল আভাসে চেয়েছিল ও CSPW/ হামিদুর রহমান কমিশন পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল)-এ সবই ঠাঁই পেল NEP-র সুপারিশ মালায়। রিপোর্টটি মূল্যবান এ জন্য যে, এর সূর ইতিবাচক এবং এর মধ্যেই ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্বাভাস রয়েছে। এই রিপোর্টটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানের দুই অংশ যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ল।

ঙ. স্বাধীনতাত্তোর থেকে বর্তমান পর্যন্ত

পাকিস্তানের সাথে বাঙালির যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার যেসব কারণ নিহিত ছিল, তার মধ্যে প্রধান কারণ ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ। ফলে যখন ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে দেখা দিল, তখন যাত্রারম্ভে পেল এক বিধস্ত অর্থনীতি ও এক বিপর্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা।

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার প্রশ্নে সূচনাপর্ব ছিল উৎসাহজনক। ওই সময়ে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত জাতীয়করণ আদেশের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের জন্য সরকার অপেক্ষা করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় মহলের একাডেমিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিল সরকার। ১৯৬১-র ঘৃর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স এর জায়গায় এলো এক গুচ্ছ নতুন আইন, যেগুলি ছিল ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত। একই সময়ে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার, ১৯৭৩-এর মাধ্যমে ঘোষিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের জন্ম কথা।

www.pathagar.com

এ সময়ে আরও গঠিত হয় ড. কুদরাত ই-খুদার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট (মে, ১৯৭৪) এ দেশের শিক্ষা ভাবনার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। এর মধ্যে আছে সকল মাত্রায় পুনর্গঠন পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষায় বিষয়ে একটি স্বল্প মেয়াদী ও একটি দীর্ঘ মেয়াদী দৃশ্যপট।

এর সকল প্রত্যাশা ও সকল ভবিষ্যৎ ভাবনা সত্যে পরিণত হয়নি।

এই রিপোর্ট এর পুঙ্খানুপুঙ্খতা সত্ত্বেও, উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্নে বিস্ময়করভাবে নীরব। অ্যাক্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো অনেকটা সাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অনুসরণে এবং মঞ্জুরী কমিশনের যাত্রারম্ভ হলো, এই স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা বিধান-করবে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

এরপর বেশ কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি। ১৯৮৫ সালে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা, রাজশাহী, ও চট্টগ্রাম-এর সঙ্গে অধিভুক্ত কলেজগুলিও সংখ্যায় ও আকার আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির ছিল দুটি দিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক, কারণ এর মধ্যেই প্রকাশ পায় উচ্চশিক্ষা বিষয়ে জাতির আকাঙ্ক্ষা, নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে যা বেগ সঞ্চার করেছিল। এর ফলে আবার বহু সদ্যজাত কলেজকে স্বীকৃতিদানের চাপ সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর; এগুলি ছিল শিক্ষক ও সরঞ্জাম, উভয় দিক দিয়েই দুর্বল, সেহেতু অ্যাকাডেমিক চাহিদা পূরণে অযোগ্য। এটা নেতিবাচক দিক।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শুরুতেই সমস্যাটি সনাক্ত করেছিল শিক্ষা কমিশন। কমিশন শিক্ষাপ্রদায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কলেজ অধিভুক্তির দায়মুক্ত করার কথা ভেবেছিল। কমিশনের প্রস্তাব ছিল ৪টি কেবলমাত্র অধিভুক্তির দায়িত্বপালনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যারা কলেজসমূহের ব্যাপারে, দায়বদ্ধ থাকবে। এ প্রস্তাব কার্যকর, হতে হতে ১৯৯২তে এসে যায়, ওই বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্যন্ত। সত্তর ও আশি দশকে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটে প্রাথমিকও মাধ্যমিকের তুলনায় অনেক বেশি। এটা হলো প্রকৃত ও সংখ্যা তাত্ত্বিক হিসাব। কিন্তু পরিসংখ্যানই এ ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়।

স্বাধীনতার পর সরকারি পর্যায়ে আরও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া (১৯৮৫); শাহজালাল বিজ্ঞানও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (১৯৯০); খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০); বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (১৯৯২) ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; গাজীপুর (১৯৯৩)।

১৯৮০ দশকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। বিবাদমান দলগুলির মধ্যে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ ও সংঘাত, ঘন ঘন অনির্ধারিত বন্ধ ও তজ্জনিত সেশন-জট, এ পরিস্থিতির আন্ত অবসান হবে, তেমন ভরসা মিলছিল না। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা, যারা পেরেছেন ছেলে মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে অধিক সংখ্যাক এরা গিয়েছে ভারত ও আমেরিকায়।

অবস্থা যখন এরকম, তখন দেশের মধ্যেই এক বিকল্প ব্যবস্থার কথা অনেকেই ভাবতে থাকেন। উদ্দেশ্য, এমন এক উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা যা হবে প্রচলিত উপনিবেশিক সময়ে প্রবর্তিত ব্রিটিশ মডেলের ফলে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় প্রচলিত পদ্ধতির অনুরূপ।

www.pathagar.com

মডেলের পরিবর্তনেই এর শেষ এর, মূল ধারায় উচ্চ শিক্ষা, যা ছিল গণমুখী ও নিম্না কাঙ্ক্ষী, এটা ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নততর ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি ছিল। এগুলি উচ্চ হারে বেতন দাবী করেছে, তবে ক্ষতিপূরণ করেছে নির্দিষ্ট সময় ফল দিয়ে। এর শিক্ষাক্রম ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ। বর্তমানে দেশে ১৬ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্সগুলি চালু রয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর এক পেশে চরিত্র ধরা পড়বে; কিছু বাণিজ্যিক কোর্স, কম্পিউটার, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংরেজি, পরিবেশ বিদ্যা ইত্যাদি। সংক্ষেপে, এ যাবৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বাজারের কিছু উচ্চ বেতনের দাবিদার তরুণ কর্মকর্তা তৈরির জন্য শিক্ষা। যে সংকীর্ণ কর্মসূচী নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে, তার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হলে এদেশের জন্য তা ক্ষতিকর হবে।

ইতোমধ্যে প্রায় এক দশকের কার্যক্রমের পর বলা যায় যে, বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাব পড়েছে মূল ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। এর একটি দৃষ্টান্ত কোর্সের দিকে ঝুঁকেছে। এ মুহূর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গোষ্ঠীর অবস্থান হলো, একটি প্রধান ব্যবস্থার প্রান্তবর্তী একটি অপ্রধান ব্যবস্থা। ইচ্ছার হোক বা অবস্থার গতিকেই হোক, এগুলি এখন ও নিজেদের মধ্যেই নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। মঞ্জুরী কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এদেরকে সদস্যভুক্ত করেনি। কৌতূহলের বিষয় এই যে, U.G.C-এর অনুমোদন ক্রমেই এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ও U.G.C-এর আরোপিত কয়েকটি মৌলিক নিয়ম মেনে চলা এদের জন্য বাধ্যতামূলক। ১৯৯২-এর আইনই দিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ, কিন্তু এই আইন ব্যতিক্রমী। পরীক্ষামূলক কাজে প্রশ্নে অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু নতুনের প্রবর্তনীয় ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ব্যতিরেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর নামে অপলাপ মাত্র।

উপসংহার

একটা শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায় ক্রমিকভাবে গড়ে উঠেছে, যার সূত্রপাত হয়েছিল পরাধীনতার কালে। শতাব্দীকাল এর অবয়বে ছিল বৈদেশিকতার ছাপ। ধীরে ধীরে স্বজাতীয় ও প্রাচ্যদেশীয় উপাদানসমূহ স্থান পেয়েছে এর শিক্ষাক্রমে। ইংরেজি আধিপত্যের জায়গায় জনগণের ভাষা বাংলার ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ইংরেজির আবশ্যকতা ও স্বীকৃত হয়ে আছে। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো জাতীয় শিক্ষার সঠিক দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের সম্মতি। সরকারি সেক্টরের পাশাপাশি একটি বেসরকারি সেক্টর এখন ও আছে, বিশেষত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু এ স্তরে ও সরকারের অংশিদারিত্ব বেড়ে চলেছে এবং ক্রমেই অধিকতার অর্থবহ হয়েছে। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্বিভাব একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটা এবং আর ও কিছু নতুনত্ব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ব্যবস্থাটি কোন ক্রমেই সুস্থ নয়। এক অন্তঃশীল গতিশীলতা কাজ করে চলেছে, যার প্রকাশ ঘটেছে শুধু ভাবের ও চিন্তার স্তরে নয়, সংস্কার ও পরীক্ষামূলক কাজের স্তরে ও। এ মূহুর্তে এ এক সাধারণ প্রত্যয় যে, একটি স্বাধীন জাতির স্বার্থকতা অর্জনের একমাত্র পথ শিক্ষা।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষায় গণিতের সমস্যা ও তার সমাধান

সুদীর্ঘকাল হতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিকট গণিত একটি কঠিন বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আজও তা কঠিন বিষয় হিসেবে পরিচিত আছে। গণিত এমন একটি বিজ্ঞান যা থেকে পার্থিব জগতের সকল সমস্যার সমাধান করা যায়। পেয়ার্সের মতে "গণিত এমন একটি বিজ্ঞান যা নির্ভুল সিদ্ধান্ত পৌছায়"। বাস্তবিক পক্ষে একজন মানুষ সমাজে বেঁচে থাকার জন্য তার যেমন ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি গণিতের মৌলিক জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ মতে গণিত এমন একটি শাস্ত্র যা হতে বাস্তব জীবনে সংখ্যা, অংক, সংখ্যার ব্যবহার, এককথায় হিসাব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। সেজন্য গণিতের ব্যবহার পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান এমনকি অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রসারীত আছে। গণিতের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের দেশে গণিতকে শিক্ষার্থীদের নিকট আবশ্যিক বিষয় হিসেবে (বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যেকোন পরিমাপের জন্য একক প্রয়োজন। একক ছাড়া পরিমাপের সুনির্দিষ্ট কোন মান পাওয়া যায় না। এককে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) মৌলিক একক (২) যৌগিক একক। গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে ও পদ্ধতিগতভাগে দুটি প্রধান অংশ আছে। (১) মৌলিক পদ্ধতি ঃ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, (২) যৌগিক পদ্ধতি ঃ আয়তন, ক্ষেত্রফল, বর্গ, বর্গমূল গড়, ইত্যাদি। পদ্ধতিগতভাবে শিক্ষালাভের অনুশীলনে ব্যর্থ হলে গণিত একটি কঠিন বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিচিত হয়। মৌলিক পদ্ধতি সাধারণত ঃ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন শিক্ষার্থী মৌলিক ধারণা থেকে বঞ্চিত হলে পরবর্তী যৌগিক পদ্ধতি শিক্ষা লাভ তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শ্রেণী কর্মের অনিয়ম গণিত শিক্ষার অন্তরায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পাঠ্যসূচী প্রণয়নে যেভাবে গণিতের সমস্যাগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে ঠিক সেভাবে ক্রমান্বয়ে শিক্ষালাভ করা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর কর্তব্য। কিন্তু যারা ওই ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে দিয়ে বাছাই করা কয়েকটি পর্ব হতে পড়া আয়ত্ব করার চেষ্টা করে তাদের ক্ষেত্রেই গণিত একটি কঠিন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষোপকরণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে না পারায় শিক্ষার্থী বিষয় বস্তু সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পেতে পারে না, ফলে তাদের নিকট গণিত একটি বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়।

www.pathagar.com

অনেক শিক্ষার্থী তার পঠিত বিষয় স্মরণ রাখতে পারে না। একবার অধ্যয়ন করার পর পরবর্তিবার পাঠ করতে গিয়ে প্রায়ই ভুলে যায়। আর তার জন্য গণিত হয়ে পড়ে একটা বিরাট সমস্যা।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না নিয়ে যদি কোন শিক্ষার্থী গণিত শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে চায় তাহলে তার পক্ষে সঠিক শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় না। ফলে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর ভয়ভীতি বেড়ে যায়। এ কারণে বিষয়টি হয়ে উঠে বিরাট সমস্যা।

পদ্ধতিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভ করতে হবে গণিতের মৌলিক পদ্ধতি জানা না থাকলে কোন ক্রমেই পরবর্তী যৌগিক পদ্ধতি কার্য সম্পাদন করা যায় না। যেমন গড় নির্ণয় করতে হলে প্রথমে যোগও পরে ভাগ করে নির্ণয় করতে হয়। সুতরাং মৌলিক পদ্ধতির উপর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞান থাকতে হবে।

নিয়মিত শ্রেণীকর্মে উপস্থিতি গণিত শিক্ষার্থীর পক্ষে সহায়ক। দৈনন্দিন শ্রেণী কর্মে উপস্থিত থেকে গণিতের প্রতিটি স্তবক বুঝে নিয়ে বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে গণিত বিষয়টি আয়ত্তে আনতে হয়। সুতরাং গণিত শিক্ষার্থীকে অনিয়মিত উপস্থিতি পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষোপকরণ, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের একটি বিরাট মাধ্যম। প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীর বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকূল। এখন কথা হল, কি কি উপকরণ শিক্ষার্থীকে বাস্তব শিক্ষা দেবে?

১. Movie projector
২. Over head projector
৩. Slide projector.
৪. Model.
৫. Chalk board.
৬. Flunnel board ইত্যাদি।

প্রজেক্টার সম্পর্কিত যে সকল উপকরণের কথা বলা হল। শ্রেণী কক্ষে এদের ব্যবহার প্রায়ই অসম্ভব। কারণ এদের প্রতিটি যন্ত্রের দাম অনেক বেশি! আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এমন যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নয়। তবে সরকার দেশে Audio visual Equipment হিসাবে Television-এর মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই প্রচারে কোন ক্রমেই শিক্ষা দেওয়া যথেষ্ট নয়। যা হউক। আমাদের দেশে সর্বোপরি একজন শিক্ষকই হলেন Audio visual Equipment তিনি যদি সুবিন্যস্তভাবে বিষয়বস্তুর উপর পাঠদান করেন তাতেও শিক্ষার্থী যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে হস্ত তৈরি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, চার্ট, মডেল, ফ্রানেল বোর্ডকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উপকার হবে।

কোন কিছু মুখস্ত করে স্মরণ রাখতে না পারাও একটি বিরাট সমস্যা। আর এ ধরনের সমস্যা আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যেই চরম। দার্শনিকদের মতে

www.pathagar.com

স্মরণ রাখার পদ্ধতি দুটো।

১. সম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতি (Method of Corelation)

২. অনুশীলন পদ্ধতি (Mothod of Exercise)

সম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতি হল কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে যদি তা জানা কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক করে নেয়া হয় তবে নতুন বিষয়টি দীর্ঘদিন মনে রাখার সহায়ক হবে। দ্বিতীয়তঃ অনুশীলন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে পঠিত বিষয়ের উপর বার বার পাঠ করতে হয়। তাতেও বিষয়বস্তু দীর্ঘদীন মনে রাখার সহায়ক হয়।

গণিত একটি বিজ্ঞান। একজন বিজ্ঞানী তার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে বিন্যস্ত করে নেন।

১। সমস্যা নির্ধারণ করা।

২। সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা।

৩। বিশ্লেষিত সমস্যার তথ্য সংগ্রহ করা।

৪। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

একজন গণিত শিক্ষার্থী যদি উপরোক্তভাবে গণিতের কোন সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে সমাধান করার চেষ্টা করে তবে সহজেই তা সমাধান করা সম্ভব।

গণিত বিজ্ঞানের মেরুদণ্ডস্বরূপ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গণিতের ব্যবহার প্রতিদিন বর্ধিত হারে ও চমকপ্রদভাবে নতুনত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। গণিতের জ্ঞান ছাড়া এ সকল বিষয়ে পাঠ দুঃসাধ্য। বিজ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে চরম কাজই হল গণিতের ব্যবহার এবং তাদের আবিষ্কারগুলোকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করা। গ্যালিলিও, ডেকার্তে, হিউগেন্স, কেপলার, নিউটন ও আইনষ্টাইন সকলে এ গণিতের ফর্মূলা বা সমীকরণ আবিষ্কার করেছিলেন। রসায়নের পরিমাণগত বিশ্লেষণে ল্যাভয়সিয়ে এবং হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলের পরিমাণ নির্ণয় করতে উইলিয়াম হারভে গণিতের সার্থক ব্যবহার করেছেন। এছাড়া গবেষণা ক্ষেত্রে, সংখ্যাতত্ত্বে, কারিগরি শিক্ষায় গণিতের জ্ঞান অপরিহার্য। জীবন ও শিক্ষার প্রতিটিক্ষেত্রে প্রতিদিন পরিমাণ নির্ধারণ করার প্রয়োজন বাড়ছে। কোন কিছু যথার্থ করে বলার অর্থ হল পরিমাণের মাধ্যমে বলা। আবেগ প্রধান বিষয়, কবিতা ও গানের মধ্যেও ছন্দে তালে গণিতের সূক্ষ্ম ব্যবহার পরোক্ষভাবে কাজ করছে।

www.pathagar.com

পরীক্ষায় নকল ও তার প্রতিকার

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই কোন ব্যক্তি তথা জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। শিক্ষাবিমুখ জাতি সবসময় বিকলাংগ। শিক্ষাবিমূখ জাতি কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তাইতো বলা হয়ে থাকে, "কোন জাতিকে যদি পর্যুদস্ত করতে চাও তাহলে তার শিক্ষাও সংস্কৃতিকে ধ্বংস কর।"

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে আজ পর্যন্তও কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ অর্থে পুঁথিগত বিদ্যার্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কৌশল জানা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে জীবিকার্জনের জন্য জ্ঞান লাভ করা।

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হল, মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"

প্লেটোর মতে, 'শরীর ও আত্মার পূর্ণতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই হল শিক্ষা।"

এরিষ্টটলের মতে, "ধর্মের পবিত্রতার ভিতর দিয়ে সুখ লাভই শিক্ষা।"

জনকমেনিয়াস এর মতে, 'সমগ্র মানুষটির বর্ধনই হল শিক্ষা।"

ফ্রেডারি হারবার্ট এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।"

হারবার্টরীডের মতে, "মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষা। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে যাহা সাহায্য করে তাই শিক্ষা।"

কবি মিলটনের মতে, "মানুষের অভ্যন্তরে আসল মানুষটির পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা।"

আল্লামা ইকবালের মতে, "মানুষের বুদ্ধির উন্নয়নই আসল শিক্ষা।"

আল্লামা মওদুদী (রহঃ) এর মতে, "যে মানুষগুলো জন্ম নিল তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতা এখনও অপরিপক্ক ও অপরিণত অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে সর্বোত্তম পন্থায় লালন পালন ও পরিপোষণ করে যে সমাজে তারা জন্ম গ্রহণ করেছে সেই সমাজের উপযোগী সার্থক সদস্য বানানো এবং ঐ সমাজের বিকাশ কল্যাণ ও উন্নতির সহায়কে পরিণত করার নামই শিক্ষা।"

যার সংজ্ঞা এত উন্নত, যে শিক্ষা পৃথিবীর অন্ধমানুষগুলোকে জ্ঞানদীপ্ত সৌন্দর্যময় পৃথিবী উপহার দিতে চায় সেই শিক্ষা অর্জনের কোন ধরাবাঁধা সময় নেই। কারণ আল হাদিসে উল্লেখ আছে, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন কর।'

www.pathagar.com

"শিক্ষার্থীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।"

"জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীনদেশে যাও।" মৃত্যুর পূর্বে শিক্ষার সমাপ্তি যদিও নেই তবুও শিক্ষাকাল মূলত ঃ ছাত্র জীবনেই অনেকাংশে সীমাবদ্ধ। তাই শিক্ষা জীবনে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অত্যন্ত সচেতন ও শিক্ষা প্রতি যত্নবান হতে হবে।

ছাত্র এর ইংরেজি প্রতি শব্দ 'STUDENT'। এখানে ইংরেজি সাতটি বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা গঠিত একটি শব্দ। প্রকৃত পক্ষে এটি Abbreviation-যার বিশ্লেষণ-S-Studious. T-Trutheful. U-Unity, D-Devotion, E-Energetic, N-Neatness, T-Talented.

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর অন্ততঃ সাতটি গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে আদর্শ ছাত্র হিসাবে জীবন গঠন করার পরিবর্তে শুধু পরীক্ষা পাশের মাধ্যমে সনদ প্রাপ্তির আশায় নিজেকে শিক্ষিত বলে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ফলে শিক্ষা জগতে মহাসংকট সৃষ্টি করে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করার প্রয়াসে তারা লিপ্ত। যার জ্বলন্ত প্রমাণ পরীক্ষা কক্ষে অসদুপায় অবলম্বন। এই মহামারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুটি পর্যন্ত। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণ বহুবিধ। এইজন্য দায়ী ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসন।

১। ছাত্রদের নৈতিক অবক্ষয়, লেখাপড়ায় উদাসীনতা কারণে অকারণে ক্লাশ বর্জন, মিছিল, সভাসমিতির বাহানা ইত্যাদি কারণে সময়ের অপচয় করে নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর পাঠ অধ্যয়নে অসমর্থতা।

২। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে শিক্ষকদের ভূমিকা ও পিছিয়ে নেই। শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। তাকে হতে হবে পূত পবিত্র অথচ আজকাল কিছুসংখ্যক শিক্ষক তাদের পবিত্র পেশাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করে যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে এবং সুস্থ চিন্তা ধারাকে অবাস্তব চিন্তায় পরিণত করে শিক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করে আসছেন। এই কারণে শিক্ষার্থী সে সকল শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অসদুপায় অবলম্বনের দিকে ঝুকে পড়ছে।

৩। আজকাল অভিভাবকগণের মধ্যে অনেকেই এই সকল দুর্নীতিকে পছন্দ করে তাদের সন্তানদেরকে অসদুপায় অবলম্বনে উৎসাহিত করেন। ফলে সেই সকল ছাত্ররা অভিভাবকদের এই দুর্বলতার সুযোগে প্রকৃত লেখা পড়ায় বিরত থেকে একমাত্র অসদুপায়কে অবলম্বন করার সাহস পায়।

৪। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যে ছাত্ররা ইচ্ছা করলেই নকল করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কারণ প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যা যেকোন সাহায্যকারী পুস্তকের পাতা খুললেই সরাসরি পাওয়া যায়। ফলে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

৫। অসদুপায় অবলম্বনে প্রশাসনিক ভূমিকাকেও বাদ দেওয়া যায় না। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেও এইসকল দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৬। পুরাতন 'জগ' ও 'মগ' থিওরী বর্তমানে অচল। 'জগ' স্বরূপ শিক্ষক 'মগ' স্বরূপ ছাত্রকে কিছু ঢেলে দেবেন এবং সে তা নিয়ে নেবে এটা এখন চলে না। আধুনিক শিক্ষানীতির মূল কথাটা হচ্ছে শিক্ষা দান নয়, শিক্ষাগ্রহণ। ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষা সম্পর্কীয় তিনটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে শিক্ষার্থী তাকে কেন্দ্র করেই আর সব কিছু আবর্তিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক (Child centred) শিক্ষক কেন্দ্রিক (Teacher centred) নয়।

প্রতিকার

১। Teen ager বলতে ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের বয়স বুঝায়। এই বয়সে অনেক ঝরঝঞ্জাট থাকে যাকে বয়সন্ধিকাল বলে। এই বয়সে সকল ছাত্রকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করে গড়ে তুলতে হবে জীবনকে। শিক্ষার্থীরা যদি এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় মিশে যায় তবেই তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হবে। যার ফলে পরীক্ষা কক্ষে অসদুপায় অবলম্বনে বাঁধা প্রদানকারীর খারাপ আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এ বয়সের ছাত্রদেরকে নৈতিক অবক্ষয়, পড়াশুনায় অমনোযোগী, ক্লাস বর্জন, মিছিল সভাসমিতি ইত্যাদি থেকে রেহাই করে প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিবীদ, প্রশাসক, প্রত্যেকেরই এগিয়ে আসা উচিত। বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাদেরকে রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে। তাহলেই শিক্ষার্থীগণ অসদুপায় থেকে অনেকাংশে রেহাই পেতে পারে।

২। সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। শিক্ষক একজন পবিত্র ব্যক্তি এবং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত পবিত্র। শিক্ষক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'TEACHER'।

এই Abbreviation-এর বিশ্লেষণ—

T-Truthful, E - Energetic, A-Aniable, C-Chaste, H-Honest, E-Enthusiatic, R-Reader.

উপরোক্ত অন্ততঃ সাতটি গুণাবলীর অধিকারী একজন প্রকৃত আদর্শ শিক্ষক। তাঁর গুণের কথা, মর্যাদার কথা ভেবে তাকে কাজ করে যেতে হবে। শিক্ষকতায় ব্যবসায়িক মনোভাব পরিহার করে যথাযথ দায়িত্ব পালনে এবং অবাস্তব চিন্তামুক্ত রেখে শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হবে। শিক্ষার্থীগণকে প্রকৃত শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত করে শিক্ষামূলক কাজে খাটাতে হবে। শিক্ষার্থী যদি তার কর্মে অনুপ্রাণীত হয়ে রীতিমত কাজ করে যেতে প্রয়াস পায় তাহলেই হয়ত অসদুপায় অবলম্বন নামক ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে পেশাগত জীবনে তিনি একজন শিক্ষক।

৩। প্রত্যেক অভিভাবককেও সচেতন হতে হবে। অসৎ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত আলোর পথে পরিচালিত করে সৎ চরিত্রবান হওয়ার জন্য সাহায্য করতে হবে। সৎ উপদেশ দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে অসৎ পথ

www.pathagar.com

থেকে। সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উৎসাহ প্রদান করতে হবে। মনে রাখতে হবে আজকের সন্তান আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাহলেই তারা সু-শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অসদুপায় অবলম্বনের পথ বর্জন করতে হবে।

৪। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মাধ্যমেও অসদুপায় অবলম্বন হতে ছাত্রদেরকে বিরত রাখা যায়। প্রশ্নপত্র যদি পাঠ্য বইয়ের গুটি কয়েক নির্ধারিত প্রশ্নপত্রেই সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকৃত জ্ঞান পরিমাপের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীগণ হুবহু উত্তর বই থেকে না পেলে নকল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে। তখন বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থী পড়াশুনা শেখায় মনোনিবেশ করবে।

৫। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে এবং বাহিরে প্রশাসনিক আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের নকল প্রবণতাকে বিরত করতে সাহায্য করে। বাহির থেকে পরীক্ষা কক্ষে নকল প্রবেশ করা সমাজের কিছু সংখ্যক লোক আগ্রহী। সেই কর্মকে বাঁধা সৃষ্টি করতে এবং কক্ষের অভ্যন্তরে নকল বাঁধা প্রয়োগকারী শিক্ষকের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের অসৎ আচরণ থেকে বিরত রাখতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজন। প্রশাসন যদি কঠোরভাবে তা দমনের ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলেও নকল প্রবৃত্তি বন্ধ হতে পারে।

৬। শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি অপরটির পরিপূরক। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্থকতার জন্য আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন শিক্ষার্থী ও তার পারিপার্শিক তথা শিক্ষক অভিভাবক ও সমাজের লোকজনের মধ্যে আগ্রহের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মান এর উন্নয়ন। মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সমাজ সংরক্ষণে এবং দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সমাজের পছন্দনীয় প্রচলিত রীতিনীতি ধরে রাখার জন্য এবং এদের দেশের উপযুক্ত নাগরিক ও সমাজের উপযোগী সদস্য হিসাবে বের করা এটার আজ বেশি প্রয়োজন।

বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাবনতি রোধ অত্যন্ত জরুরী। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবমহলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও সচেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। পরম করুণাময় আল্লাহতায়লা দেশের এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হতে এবং এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে তৎপর হতে সাহায্য করুক এ কামনাই করি।

www.pathagar.com

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকের কর্মজীবনও দৈন্যদশা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাদের রয়েছে মৌলিক সত্ত্বা, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীনতা। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এই স্বাধীন প্রাণী মানুষকে শিক্ষাদান কাজে যারা নিয়োজিত তারাই শিক্ষক নামে পরিচিত। আর এই শিক্ষকই তার শ্রম ও মেধা শিক্ষাদান কাজে ব্যয় করে সারাটি জীবন অসহায় অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে থাকেন। শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। কাঁদা যেমন কুমারের ছাঁছে পড়ে প্রয়োজনীয় সুন্দর বস্তুতে পরিণত হয় তেমনি একজন নিষ্পাপ মানব শিশু শিক্ষক নামক কারিগরের হাতে পড়ে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। অন্যান্য কাজের কারিগর হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার; কিন্তু মানুষ গড়ার কারিগর হওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়।

দু'শ বছরের অধিককাল সময় ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসকের শাসন আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তাতে গণমুখী, জীবন ধর্মী, বৃত্তিমূলক, মেধা ও মননের বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্য ছিল না। তার কারণ হল ব্যক্তি ও জাতি শিক্ষার দ্বারা সচেতন হয়ে উঠলে শাসকের সিংহাসন কেঁপে উঠবে এ আতংকই কাজ করেছে তাদের এ শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের পেছনে।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ন' মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাংলাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসকদের আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে বটে কিন্তু আমাদের দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকের ভাগ্য পরিবর্তনের চিন্তা তখনও সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ও তারই সাথে আমাদের দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকের ভাগ্যোন্নয়নের কথা শুনা যাচ্ছে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ও মত প্রকাশ করে থাকেন। বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলনেও এ কথাটা বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই কোন ব্যক্তি তথা জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। এ আদর্শ সমুন্নত রেখে শিক্ষক সারা জীবন দেশ ও জাতির সেবা করে থাকেন। তিনি সমাজে আদর্শ স্থানীয়। তিনি তার প্রধান হাতিয়ার পরিশ্রম ও মেধাশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত কোন বিষয়ে পাঠদান করে থাকেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত জ্ঞান দেয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। নিজের বাসস্থানে বা অন্যত্র নিজের সন্তানকেও তিনি এরূপ জ্ঞানদান করতে পারেন না।

www.pathagar.com

কারণ পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন জীবিকা অর্জনের জন্য। তদুপরি নিজের সন্তানদের দিকে তাকানোর ধৈর্য ও সময় তার থাকে না। একজন নিষ্ঠাবান ও ব্যক্তি সচেতন শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদান কাজে ফাঁকি দেয়ার চিন্তা করতে পারেন না। যে শিক্ষক শিক্ষাদান কাজে ফাঁকি দেয় না তাঁর শিক্ষার্থীদের মাঝেও ফাঁকির মনোভাব গড়ে উঠে না।

আজকাল শিক্ষকের মুখে শুনা যায় শিক্ষার্থীরা এখন আর শিক্ষককে মান্য করে না, শ্রদ্ধা করে না লেখা পড়ার অমনোযোগী ও কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষায় প্রহসন নিয়ে পত্রিকায় সমালোচনার খবর ছাপা হয়। যেকোন পরীক্ষায় সকল ছাত্র কৃতকার্য হতে পারে না, ইহা সত্য। পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সুধী মহল ও অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষককে দায়ী করে থাকেন। শিক্ষার কাজে সরাসরি জড়িত ছাত্র-শিক্ষক। কিন্তু অধুনা রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, পারিবারিক কোন্দল, নৈতিক অবনতি উপরন্ত সন্ত্রাসমূলক কারণে সমাজ জীবনে যে অশান্তি নেমে আসে তাতেই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটে থাকে।

এখন শিক্ষকের ভেবে দেখার সময় এসেছে-কেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে মান্য করে না, শ্রদ্ধা করে না। বাইরে যাদের নিরাপত্তা নেই, ঘরে যাদের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই-শিক্ষক বলতে আমাদের কল্পনার চোখে ভেসে উঠে এইরূপ অস্থিসার দেহ বিশিষ্ট অনাহার ক্লিষ্ট, চক্ষু কোটরগত একটা প্রাণী। তার পরিধানে থাকে নিতান্তই হাতে ধোয়া কমদামী নামে মাত্র পোষাক, খালি পা, হাতে ছেঁড়া ছাতি। এ সমাজে তার চাওয়া ও পাওয়ার কি কিছুই নেই? সে শুধু মানুষ গড়ে যাবে-বৃক্ষের মত হবে তার আদর্শ। তবে তাকে বাঁচানোর জন্য শিকড়ে পানি দেয়ার কি কোন প্রয়োজন নেই? এ আধুনিক সভ্যতার যুগে সে বাঁচবে কেমন করে? এ চিন্তা আমাদের সুধী-মহলের মনে জাগ্রত হউক।

যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করে বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক। চাকুরী কালীন অবস্থায় সে শিক্ষক কি পান? চাকুরী শেষেই বা তিনি কি নিয়ে ঘরে ফেরেন? তারও তো অন্য দশজন পেশাজীবির মত স্ত্রী, পুত্র, কন্যার ভার রয়েছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আনন্দ উৎসব, সামাজিকতা তার কি নেই? কোথায় কার সন্তান নিজের দোষে গোল্লায় গেল ধরে এসে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেশাজীবী অসহায় শিক্ষককে। যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা বিদ্রোহ করতে জানে না, ধ্বংস করতে পারে না। নৈতিকতার অধিকারী হয়ে তারা সব সময়ই সংযমের পরিচয় দিয়ে সম্মানের পাত্র ও গালভরা বুলির সান্তনায় বেঁচে থাকেন।

আমাদের দেশে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কপটও অসাধু ব্যক্তি রয়েছেন যারা দেশ ও জাতির স্বার্থের চেয়ে নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখেন। তারা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে পরীক্ষা হলে নকল সাপ্লাই দেন, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন প্রচণ্ড প্রতাপ ও দাপটের সাথে এমন সব অবৈধ কাজ হর হামেশাই করে থাকেন। এ কাজে পরোক্ষভাবে তারা ছাত্র ও অভিভাবকের উৎসাহ পাচ্ছেন। শিক্ষক নামধারী শিক্ষক সমাজের কলংক তারা। তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণার আগুন জ্বলবে। সংশ্লিষ্ট প্রশাসক এবং অভিভাবক-সকল মহলকেই এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.pathagar.com

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে দৈনিক ৪০ মিনিটের ৬ থেকে ৮ টা ক্লাশ করতে হয়। গ্রামের স্কুলগুলোতে উপযুক্ত পরিবেশ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। ছাত্র বেতনে বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষককে সামান্য অর্থই দেওয়া হয়। আর অধুনা কতিপয় ছাত্র চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, এমন কি আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করে থাকে এবং তারা পরীক্ষায় পাশ করানো ও বেশি নম্বর দেওয়ার জন্য শিক্ষককে নানা প্রকার হুমকী প্রদর্শন করে থাকে। পক্ষপাতিত্ব ও পারিপার্শ্বিক চাপে শিক্ষক হয় আরও অসহায়। বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থীকেও শাসন করতে তার ভয় লাগে। পরীক্ষায় নকল ধরাতো প্রাণনাশের হুমকী স্বরূপ। উদীয়মান মস্তান নেতারা আসে শাসাতে। তাতেও শেষ নেই। তদুপরি মামা, চাচা..... বড় ভাই, নেতা ..... ইত্যাদি বলে প্রতিশোধ নেবার হুমকী প্রদর্শন করে থাকে।

শিক্ষক বিদ্যার বেসারতী করেন। তিনি অবৈধ ব্যবসা করেন না, চুরি, ডাকাতি করেন না, ভাংচোর রাজনীতি করেন না। তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক তৈরি করেন, সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষার উপরেই দেশ ও জাতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ও বিস্তারে দেশের বর্তমান সদাশয় সরকার সচেষ্ট। শিক্ষাকে জাতীয় ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষাকে সমাজে মর্যাদা দিতে হবে।

এ দেশের শিক্ষক যে কত অসহায়, তা আর তর্জনী উচিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। পরের সন্তানকে যারা মানুষ করছে, তাদেরকে যেন আর পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে কষ্ট পেতে না হয়, এবং অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা না হয়, সে কথা এখন ভাববার দিন এসেছে।

www.pathagar.com

জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, যে মুসলিমরা পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্যা, গণিত, আইন শাস্ত্রে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রুচিশীল সভ্য ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় শাসন করতো আজ তাঁরাই শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি সব দিক থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকার পেছনে পড়ে আছে। আজকের এই ইউরোপ সম্পূর্ণভাবে আরব সভ্যতার অনুকরণে গড়ে উঠেছে। মুসলিম সভ্যতার চরম বিকাশ লাভ করে স্পেনে। মুসলিম স্পেনে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সার্বজনীন। কোন মুসলমান অশিক্ষিত থাকলে তা তার জন্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার ছিল।

যখন ইউরোপ "অন্ধযুগের" অভিশাপে শিক্ষা শুধুমাত্র গীর্জা ও মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন কর্দোবা, গ্রানাদা, সেভিল, ভ্যালেনসিয়া, তলেদো, জাতিভা ও আলমেরিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গড়ে উঠেছিল। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ, যেকোন বিষয়ে পড়া-শুনা করতে পারতো। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ভীর করতো। জাত শত্রু খ্রিস্টানরাও এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতো। দ্বিতীয় 'পোপ সিলভারষ্টার' জারবাত এর শিক্ষা লাভ ঘটেছিল কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মুসলিম স্পেনে শিক্ষার বাহন ছিল আরবী ভাষা। আরবী শিক্ষা শিক্ষিত বিশ্বের সাধারণ সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতো। আরবী কবিতা স্পেনের অমুসলিমদের মুখে মুখে ফিরতো। কিন্তু স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোরান ও মুসলিম আইন ছাড়াও গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, কবিতা, শিল্প, রসায়ন ও সঙ্গীত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হতো।

মুসলিমদের গৌরবের দিনে শুধু স্পেনেই শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল তা নয়। শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি মানসিক সমৃদ্ধির দিক দিয়া খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এমনকি তদপেক্ষা ও অধিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যখন মুদ্রণ যন্ত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল প্রত্যেক খানা পুস্তক সুদক্ষ নকল নবীশের নিপুণ হস্তে লিখিয়ে নিতে হতো, তখন মিশরের সুলতান মোস্তানসিরের লাইব্রেরীতে আশি হাজার, ত্রিপোলীর লাইব্রেরীতে দুই লক্ষ, স্পেনের খলিফা দ্বিতীয় হাকীমের লাইব্রেরীতে ছয় লক্ষ ও কায়রোর ফাতেমিয়া খলিফাদের লাইব্রেরীতে দশ লক্ষ পুস্তক ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হালাকুখার হস্তে যখন বাগদাদ নগর ধ্বংস হয়, তখন নিক্ষিপ্ত পুস্তকের কালিতে তাইগ্রীস নদীর বুক আচ্ছন্ন ও তার জলরাশী কালো হয়ে যায়। আর এর চেয়ে বেশি পুস্তক বর্বর মঙ্গোলেরা অগ্নিতে দগ্ধ করে।

www.pathagar.com

স্পেনীয় মুসলিম মহিলারাও শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদবর্তী ছিলেন না। স্পেনে পুরুষদের শিক্ষাঙ্গনের পাশাপাশি মেয়েদের স্কুল কলেজ গড়ে উঠে। ছেলেদের মতো মেয়েরাও স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো। মুসলিম স্পেনে খুব কম মেয়েই অশিক্ষিত ছিল। মেয়েদের মধ্যেও জ্ঞান প্রতিযোগিতা চলতো এবং একে অপরকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করতো। মহিলারা উপযুক্ত জ্ঞানী হলে সরকারী উচ্চ পদে সমাসীন হতে পারতো এবং পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা লাভ করতো।

কদোবার আল মুসতাকফীর কন্যা ওয়াদাল্লাহ্ ছিলেন একজন প্রথম সারির মহিলা কবি। ছন্দ প্রকরণে তাঁর অসম্ভব বুৎপত্তি ছিল। কর্দোবার রাজপুত্র আমদ এর মেয়ে আয়েশা ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা বক্তা। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে এক বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। দার্শনিক লাবানা একজন স্পেনীয় মুসলিম রাজকন্যা ছিলেন। তিনি তাঁর যোগ্যতা বলে স্পেনীয় খলিফার ব্যক্তিগত সচিব হতে পেরেছিলেন। সেভিলের ইয়াকুব আল আনসারির কন্যা ফাতেমা ছিলেন একজন বিখ্যাত কবিও শাস্ত্র বিশারদ। ইসলাম ধর্মের নরনারীর সমর্যাদা ও জ্ঞানার্জনের উভয়ের সমান অধিকার স্বীকার করে বলে স্পেনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞানার্জন করতো।

মুসলিম স্পেনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাই অধ্যয়ন করা হয়েছিল। স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জন এবং গবেষণার অবারিত সুযোগ থাকায় স্পেনের বহু কবি, দার্শনিক, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও আইনজ্ঞের আবির্ভাব হয়। স্পেনের কবি, দার্শনিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী সকলেই আধুনিক বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র। মুসলিম স্পেনের এসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের ঋণ পৃথিবী কোন দিনই শোধ করিতে পারবে না। তাই এরা চিরদিন আমাদের শ্রদ্ধেয়। এ সময়ে যে সব জ্ঞান পুরুষ তাদের উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১। ঐতিহাসিক

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের নাম বিশ্বের সব ইতিহাসের ছাত্রের কাছে সুপরিচিত। তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখেন। এইজন্য তাহাকে আধুনিক ঐতিহাসিকদের গুরু বলা হয়। ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে তার জন্ম। ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে গমন করেন। ইবনে খালদুনের সারা জীবন নানা রকমের উত্থান পতনের মধ্যে কাটা সত্ত্বেও তার প্রতিভাকে তিনি অমলিন রেখেছেন।

মুসলিম স্পেনের প্রত্যেক খলীফাই রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য ঐতিহাসিক নিযুক্ত করতেন। প্রত্যেক শহর ও প্রদেশে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন। বাদাজোজের ইবনুল আফতাশ ও ইবনুল খাতিব, তলেদোর ইবনুল আহমদ, কর্দোবার খাজরাজি, আল গাজ্জাল, আল হিজারী, মাককারি, আরাবী, মুহাম্মদ বিন-ইউসুছ, ওয়াহিদ বিন-সামার, ইবনুল কুতিয়া প্রমুখ ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

২। চিকিৎসাবিদ

স্পেনীয় মুসলমানরা চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করে। গ্রীক চিকিৎসকরা ফার্মেসী এবং ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় মোটেই পারদর্শী ছিল না। মুসলিম

www.pathagar.com

চিকিৎসকরাই সর্ব প্রথম চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেন। তাঁরাই প্রথম 'ক্যামিক্যাল ফার্মেসী' বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং চিকিৎসালয় (Dispensary) প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে যোহর (Aven Zoar) পেনাফ্লোরে জন্ম গ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিদ্যায় অপূর্ব সাফল্যের জন্যে তিনি প্রচুর সুনাম ও অর্থ উপার্জন করেন। তিনিই প্রথম গলায় সাফল্যজনকভাবে অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োগ করেন এবং বহু রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেন। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুস্তক, 'কিতাবুত তাইসির' এর প্রণেতা। এই বইটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যাহরাবীও একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর শল্য চিকিৎসার বইটি আজও চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রদের জন্যে প্রয়োজনীয়। বিখ্যাত চিকিৎসক ইয়াহ ইয়া-ইবনে ইসহাক ছিলেন দ্বিতীয় আবদুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকও বিখ্যাত। ইবনে সীনার 'চিকিৎসা পদ্ধতি' ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পাঠ্য ছিল।

"জুন্দিসাবুর, বাগদাদ, কায়রো ও দামেশকের বড় বড় কলেজের আবিষ্কার ও চিকিৎসা পদ্ধতি হাতে পাওয়ায় স্পেনীয় মুসলমানদের অত্যন্ত সুবিধা হয়। এ সকল কলেজের অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক স্পেনে বসতী স্থাপন করেন। তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের যুগ যুগান্তরের অধ্যায়ন ও পরীক্ষালব্ধ বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধিত হয়"।

"রাযীর বিশ্বকোষ, ইবনে সীনার চিকিৎসা পদ্ধতি ও আলী ইবনে আব্বাসের মেলিকির সহিত যথা সময়ে স্পেনীয়দের পরিচয় ঘটে। তেহরান ও কায়রো কলেজে গৃহীত হবার পূর্বেই কর্দোবার ছাত্রেরা ইবনুল হায়ছাম ও আলী ইবনে ঈসার গ্রন্থাবলী ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খলীফাদের লাইব্রেরীতে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পুস্তকই পাওয়া যেত। ... মোহাম্মদ ইবনুল কাসুমের চক্ষুরোগ বিষয়ক গ্রন্থ ৬০০ পৃষ্ঠায় ও মোহাম্মদ আত তেমিনীর ফোড়া (Tumour) ও অন্ত্র বৃদ্ধি রোগ (Heruia) চিকিৎসা পুস্তক প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়"।

মুসলিম চিকিৎসকরা প্রথমে জীব-জন্তুর ব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন এবং পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে নিহত সৈনিক বা মৃত শত্রুদের লাশ ব্যবচ্ছেদ শুরু করেন। এভাবে তাঁরা ব্যবহারিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। পশুর চিকিৎসার জন্যেও স্পেনে ডাক্তারের অভাব ছিল না। বড় বড় শহরে পশু চিকিৎসালয়ও ছিল। আবু বকর ইবনে বদর ছিলেন বিখ্যাত পশু চিকিৎসক। সর্বপরি এ সময়কার বিখ্যাত চিকিৎসক হলেন, আবু সীনা, আবু রুশদ, আরিব বিন-সাইদ, ইয়াহ ইয়া বিন ইসাক, আবু আবদুল্লাহ, ইসহাক বিন-হাইছাম।

৩। জ্যোতির্বিদ

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে স্পেনীয় মুসলমানরা আশ্চর্যজনক উন্নতি সাধন করেন। তাঁরাই ইউরোপে প্রথম মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সৌরজাগতিক গবেষণার জন্য

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ জ্যাবির ইবনে আফলাহ ১১৯৪ সালে সেভিলের বিখ্যাত জিরাণ্ডা স্তম্ভটি স্থাপন করেন। মুসলিম রাজত্বের অবসানে মূর্খ খ্রিস্টানরা এই স্তম্ভটি গীর্জার ঘন্টা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতো।

জ্যাবির ছাড়াও মুসলিম জ্যোতির্বিদ আল মাজরিতী এবং আজ জারকালির, আহমদ বিন নসর, ইবনুল কাসিম, আবুল কাসিম এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীর গতি সূর্যের আলোর বিভিন্ন কোণ ও বিভিন্ন মাধ্যমে বিক্ষেপণ, সূর্যের সঙ্গে অন্যান্য নক্ষত্রের অবস্থানও সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন এবং প্রায় নির্ভুল তথ্য প্রদান করেন। মুসলিম জ্যোতিবিদরা এতই গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন যে, তার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব।

৪। গণিতজ্ঞ

মুসলিম স্পেনে গণিত শাস্ত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধন করে। মুসলিম স্পেনে খ্যাতিমান গণিতজ্ঞ ছিলেন-জিরাব, জাবির। সৌরজাগতিক গবেষণার জন্য জ্যোতিবিদ ও গণিতজ্ঞ জাবির ইবনে আফলাহ ১১৯৪ সালে সেভিলের বিখ্যাত জিরাণ্ডা স্তম্ভটি স্থাপন করেন। মুসলিম রাজত্বের অবসানে মূর্খ খ্রিস্টানরা এই স্তম্ভটি গীর্জার ঘন্টা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতো।

৫। দার্শনিক

দর্শনের ক্ষেত্রে স্পেনীয় মুসলিমরা ছিলেন অত্যন্ত বুৎপত্তি সম্পন্ন। রহস্যবাদী, বস্তুবাদী, চার্বাকবাদী, দার্শনিকদের অভাব মুসলিম স্পেনে ছিল না। এসব দার্শনিকরা সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, হেরাক্লিটাস, পিথাগোরাস প্রমুখ প্রাচীন দার্শনিকদের কাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিকদের সম্পর্কেও এদের গভীর জ্ঞান ছিল। স্পেনের বিখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে আবু রুশদ (Averroes) ইবনে জিব্রাঈল, ইবনে বাজা, ইবনে জ্বোহর, ইবনে তুফায়েল, লাবানার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলিম স্পেনে দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে রুশদ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। তিনি খলিফা ইয়াকুব আল মনসুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। দার্শনিক হিসাবে তাঁর প্রতিভা অন্যান্য প্রতিভাকে ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি এ্যারিষ্টটলের কাজের উপরে যে বিশাল ভাষ্য লেখেন তা ইউরোপের কাছে আজও বিস্ময়কর। সমসাময়িক মুসলিমরা ইবনে রুশদকে "শয়তানের দোসর" বলে আখ্যায়িত করতেন। পাদ্রীরা তাঁর নাম উচ্চারণ করাই পাপ বলে ধারণা করতো।

দার্শনিক ইবনে তুফায়েল গ্রানাদা প্রদেশের গোয়াদিক্স শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে " সৌরজগত ও সমগ্র তারকাই হচ্ছে জড়ের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর ধারণা ছিল যে, কোন বস্তুই অসীম নয়, এমনকি সৌরজগত ও সসীম! তিনিই প্রথম পৃথিবী ও সূর্যের প্রদক্ষিণ এবং বিষুবরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সৌরজগত হচ্ছে একটি গোলাকৃতি বস্তুপিণ্ড। এটা তিনি জেনেছিলেন চন্দ্র সূর্যের আবর্তন এবং এদের অস্ত ও উদয়ের দূরত্বের অনুপাত পর্যবেক্ষণ করে। তিনি মনে করেন যে, চন্দ্র সূর্যের আয়তন বৃত্তাকৃতি না হলে কিংবা এরা বৃত্তাকৃতি পথে না চললে তাদের

www.pathagar.com

মধ্যেকার দূরত্ব নিশ্চয়ই একই সময়ে কম বা বেশি হয়ে আসতো এবং এটা সম্ভব নয়। কারণ এর ফলে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। পৃথিবীর সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়েও তিনি প্রচুর চিন্তা ভাবনা করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে তিনি আল্লাহর ধারণা লাভ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আল্লাহ কোন জড় বস্তু হতে পারেন না। কারণ এ জড় জিনিষ তৈরির জন্যে আরেকটা জড় পদার্থের প্রয়োজন হবে। সুতরাং পৃথিবী জড় হলে পৃথিবী নিজেই আল্লাহ, এসিদ্ধান্তে আসতে হয়। আবার আল্লাহ অসীম হলেও সে সিদ্ধান্তে দ্বিধা থেকে যায়। কারণ অসীম ও অনন্ত থেকে শুধু অসীমই সৃষ্টি হয়, যেমন শূন্য থেকে শূন্যের সৃষ্টি। সবশেষে তিনি যে মূল্যবান সিদ্ধান্ত নেন তা দর্শনের জগৎ আজও খণ্ডন করতে পারেনি।

৬। আইনজ্ঞ ও বিজ্ঞানী

মুসলিম স্পেনে খ্যাতিমান আইনজ্ঞ ছিলেন আবু বকর, আল-জুবাইদী, ইব্রাহিম বিন নসর। শিক্ষা, বিজ্ঞানও সভ্যতার পীঠস্থান ছিল কর্দোবা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা ভীর করতো এখানে। কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছিল বিশ্রুত। আজকের ইউরোপ এ জ্ঞানের ভাণ্ডারের উপরেই গড়ে উঠেছে। কর্দোবার বিজ্ঞানীরাই প্রথম জলঘড়ি আবিষ্কার করেন। জলের বিন্দু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ঘড়ির কাটা আবর্তিত হতো, তা আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়ের ব্যাপার। টেলিগ্রাম, দিকদর্শন যন্ত্র, ৩২ ফুট উর্ধ্বে পানি তোলার উপযোগী নলকূপ ইত্যাদি তৈরি করেন এ কর্দোবার বিজ্ঞানীরাই। স্পেনে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেই বলা যায় যে, তারা জ্ঞানার্জনে কত আগ্রহী ছিল। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে এত গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হতো যে, যে লোক খোদা প্রদত্ত প্রতিভা না নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতো সে যাবতীয় উপায়ে তার প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করতো। দ্বিতীয় হাকাম আল-মুসতানসির-বিল্লাহ বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠ পোষকতা করতেন। খলিফাদের জ্ঞানের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেই স্পেনে এত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় নামী লেখকদের বই লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিনে নেওয়ার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হতো। বই লেখা শেষ হলেও লেখক বেশ মোটা অংকের সম্মানী ভাতা পেতেন।

স্পেনীয় সুলতানদের অনেকেই ছিলেন খ্যাতি সম্পন্ন কবি। দার্শনিক ও বিজ্ঞানী প্রথম আবদুর রহমান কবি ও দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম হিসাম ও প্রথম হাকাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সমালোচক। দ্বিতীয় আবদুর রহমান ছিলেন একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী।

৭। শিল্পী ও ভূগোলবিদ

ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যায় ও স্পেনে মুসলমানরা বিখ্যাত ছিলেন। খলিফা আল-মামুন ফার্গেল পৃথিবীর পরিধি মাপেন। বাণিজ্য যাত্রায় আরবরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান করেন। তারাই প্রথম পৃথিবী গোলাকার এবং স্থির নয়, এ তথ্য প্রদান করেন। কিন্তু এ কয়েকশ বৎসর পরেইও ইউরোপ বাসীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, পৃথিবী স্থির ও সমতল। ইবনে বতুতা, ইবনে জুবায়ের, উবায়দুল বকরী এবং ইদরিসীর নাম ভূগোলবিদ হিসাবে চিরঅম্লান আছে। ইদরিসী ছিলেন মালাগার

www.pathagar.com

অধিবাসী। তিনি বিখ্যাত কর্দোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। বনিক বেশে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে যে, বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাই তাঁকে পরবর্তী জীবনে একজন অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন ভৌগোলিকে পরিণত করে। ইউরোপ ও এশিয়া তিনি প্রথম ভ্রমণ করেন। সুদীর্ঘ পনের বৎসর ধরে তাঁর গবেষণা ও অভিজ্ঞ থেকে তিনি ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বর্ণিত ভূ-পৃষ্ঠের আকার বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া, নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ও সাম্রাজ্যের অবস্থান অত্যন্ত নির্ভুল ছিল। তিনি প্রথম নীল নদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেন।

শিল্পী হিসাবেও ইদরিসী ছিলেন বিখ্যাত। তিনি সাড়ে চার হাত ব্যাস এবং সাড়ে পাঁচ মণ ওজন বিশিষ্ট একটি রুপার ভূ-গোলক তৈরি করেন। এই ভূ-গোলকে বিভিন্ন রাশি চক্রের অবস্থান, বিভিন্ন দেশ, জল-স্থল ও পাহাড়-পর্বত অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণিত ছিল। এই বিখ্যাত মানচিত্র নির্মাণে পুরস্কার স্বরূপ তিনি এক লক্ষ রৌপ মুদ্রা এবং পণ্যদ্রব্য বোঝাই একটি বাণিজ্য তরী লাভ করেন।

৮। উদ্ভিদ বিদ্যা

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আরবীয় বৈজ্ঞানিকরা বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল। তাঁরা গ্রীক উদ্ভিদবিদ ডায়োস-করদেস-এর কাজসমূহকে ছাড়িয়ে যান। তাঁরা গ্রীক উদ্ভিদবিদদের সংগৃহীত গাছ পালার নামের সংগে দু'হাজার নতুন গাছ পালার নাম সংযোজন করেন। কর্দোবা এবং অন্যান্য শহরে বোটানী বা উদ্ভিদ বিদ্যার ছাত্রদের জন্যে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' ছিল। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো।

৯। রসায়নবিদ

রসায়নবিদ হিসেবে জাবিরের নাম অমর হয়ে রয়েছে। তিনি সোনা গালানোর জন্য Aqua-regia এবং যবক্ষার দ্রাবক আবিষ্কার করেন। স্পেনীয় মুসলমানরাই প্রথম কামানের গোলা আবিষ্কার করেন। মুসলিম রাসায়নিকবিদদের আনুকূল্যেই সাবান, সিরাপ, জোলাপ ও জৈব-রসায়নের উৎপত্তি হয়। প্রায় সব রোগের ঔষধই এই রসায়নবিদরা তৈরি করতেন। ঔষধ তৈরিতে যে বিভাগ কাজ করতো তা ফার্মেসী বিভাগ নামে পরিচিত ছিল বর্তমান ফার্মেসী আরবীয় মুসলিমদের ফার্মেসীরই অনুরূপ।

এসব ছাড়াও আরবীয় রসায়নবিদেরা স্ফটিকীকরণ, তলানীকরণ, পরিশ্রবণ, ছাঁকন, দ্রবণ পটাসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপাদান আবিষ্কার করেন। জারণ-বিজারণ সম্পর্কে ও উক্ত রসায়নবিদরা পরিচিত ছিলেন।

১০। ভাষা ও ব্যাকরণবিদ

ভাষা ও ব্যাকরণবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, আলী আল-কুতিয়াহ, আলী-আল-কুলী। মুসলিম স্পেনের শিক্ষার বাহন ছিল আরবী ভাষা। তেরশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়। আবু রুশদ, আবু পাজা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে জোহর, কাবালা ও মেইমনিদ এর গ্রন্থসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে পড়ানো হতো।

www.pathagar.com

ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষার উপরেও আরবী ভাষার প্রভাব পড়ে। হাজার হাজার আরবী শব্দ এই দুই ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে। ভাষার লালিত্যের জন্যে আরবী উচ্চারণসমূহ সহজেই এই ভাষাসমূহের স্থান অধিকার করে নেয়। এখনও ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষার সংগে আরবীর প্রচুর মিল রয়েছে। ফরাসী কিংবা স্পেনীয় ভাষার কোন কথা কিংবা গান শুনলে আজও তা আরবী ভাষা বলে মনে হয়। আরবীতে যেমন "ট" ও "ড" শব্দ নেই, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষাতেই ও তেমনি "T"- "তে" তে এবং "D" দে "তে" পরিণত হয়েছে। এই দুই ভাষার অধিকাংশ শব্দই এসেছে আরবী থেকে।

১১। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক

জিরাব, উবাদা বিন আবদুল্লাহ, ওয়ারিস বিন সুফিয়ান, সাইদ-বিন-উছমান, সাই-বিন-হাসান সন্যাসিনী রসউইদার মুসলিম স্পেনে খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে স্পেন উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছে। স্পেনের সাধারণ লোকেরাও কবিতার ভাষা কথা বলতো। ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি অধিকাংশ বই লেখা হতো ছন্দ মিল রেখে। সাধারণ কবি সাহিত্যিকরাও কোন সময়ে অমিল ছন্দে কথা বলতেন না। কবিতা ছিল তাদের মনের স্বতঃ উৎসারিত ভাবের বাহন। কবি ইবনে যায়দুন, ইবনে আহনাফ ও ইবনে হাসান ছিলেন রোমান্টিক কবিতার শিরোমনি। ইবনে সায়িদের মদির কবিতা বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খলদের মন্ত্রস্বরূপ ছিল। ইবনুল আম্মারের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান মু'তামিদ তাঁকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গ্রানাদার ইবনুল খাতিব, মারভিয়েদুর ইবনুল লেবারন, বোন্দার আবুরেকা কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল ছিলেন।

সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আবুল হাসান বিন নাফেও জিরাফ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ'। খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলে শ্রেষ্ঠ রাজ গায়ক ইসাকের কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেনি। তিনি একাধারে ছিলেন, গায়ক, সুরকার ও গীতিকার। তাঁর কণ্ঠ যেমন ছিল সুমিষ্ট, তেমনি গলার সুরও ছিল মধুর। জিরাব, ইসহাক এর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু সংগীতের দিক দিয়ে জিরাব তাঁর বিখ্যাত উস্তাদ ইসাককে পর্যন্ত হারিয়ে দেন।

একবার জিরাব তাঁর ভাগ্যান্বেষণে স্পেনের বাদশাহ হাকামের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হাকাম সাগ্রহে তাকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত জিরাব স্পেনে পৌছার আগেই হাকাম মারা যান। এ অবস্থায় তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে স্পেনের যুবরাজের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। স্পেনে তাকে রাজকীয় সম্মানে গ্রহণ করা হয়। তাঁর গান শুনে যুবরাজ মুগ্ধ হলে তাঁর জন্যে বাৎসরিক ২৪,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা বৃত্তি নির্দিষ্ট হলো। তিনি শুধু সঙ্গীতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাই নয়, কবিতা, ভূগোল, জ্যোতিবিজ্ঞান ইত্যাদিতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী।

১২। মুসলিম সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র কর্দোবা

মুসলিম স্পেনে কর্দোবা সম্পর্কে দেশি-বিদেশী লেখকরা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কর্দোবার সুরম্য অট্টালিকা, বিলাস বহুল বাগান, পণ্যে ভরা বাজার সবকিছুই

www.pathagar.com

আধুনিক সভ্যতার হিংসার বস্তু। জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল আসকার মেনাহেমডয়েটস কর্দোবা সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি বলেন "If the abbasides made Baghdad the Athens of the East, the Ommayades made cordova the centre of all the science and art of the was."

"যদি আব্বাসীয়রা বাগদাদকে প্রাচ্যর এথেন্স হিসাবে গড়ে তুলে থাকে তবে উমাইয়ারা কর্দোবাকে বানিয়ে ছিল পাশ্চাত্যের সব বিজ্ঞান ও কলার কেন্দ্রস্থল"। কর্দোবা শহরের প্রত্যেকটি রাস্তার ধারে রাত্রে সরকারী বাতি জ্বলতো, অথচ এর সতেরো বছর পরেও লণ্ডনের রাজ পথে কোন বাতির চিহ্ন ছিল না। রাজ কর্মচারীদের প্রাসাদ ছাড়াও সাধারণ লোকদেরই ১১৩,০০০ প্রাসাদ, ৩৮,০০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার ও ৮৪,০০০ দোকান ছিল। আধুনিক কোন ইউরোপীয় শহরও এত সমৃদ্ধিশালী ছিল কি না তা সন্দেহের বিষয়। কর্দোবা রাজ প্রাসাদ ও মসজিদ মালা স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব বিস্ময়।

কর্দোবার গৌরবের দিন আর নেই। হাজার বৎসর পূর্বে কর্দোবা সমৃদ্ধশালী শহর হিসাবে সারা দুনিয়াই পরিচিতি ছিল, আজ সে কর্দোবার নাম পর্যন্ত শোনা যায় না। খ্রিস্টানরা মসজিদগুলোকে গীর্জায় পরিণত করে, রাজ প্রাসাদগুলোকে ধূলোর সংগে গুড়িয়ে দেয়, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, মান মন্দিরগুলোকে গীর্জার ঘন্টার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে, লাইব্রেরীর লক্ষ লক্ষ বই পুস্তক আগুন দরিয়ে দেয়। মুসলিম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-হেতু ওরা মুসিলম কৃতির সব কিছুকেই ধ্বংস করে। পরিণামে আজ কর্দোবা অজানা, অখ্যাতও অনউন্নত একটি শহর মাত্র।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : সংকট ও সমাধান

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক। পৃথিবীর বর্তমান অগ্রগতির মূল চাহিদা শক্তি শিক্ষা। তাই জাতিকে সঠিক শিক্ষা পেতে হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন দরকার। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কম বেশি ধারণা আছে প্রায় সকলের। আমাদের দেশে স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রাম অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের অলিতে গলিতে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে।

স্কুল, কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও আগের তুলনায় অনেক বেশি। শিক্ষার বিষয়ে মানুষের মধ্যে আগের চাইতে আগ্রহ অনেক বেশি সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর ও কি আমরা বলতে পারি আমাদের শিক্ষার গুণগত মান অর্জিত হচ্ছে?

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজানোর যে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত সেই দিকে খেয়াল না রেখে আমাদের শিক্ষাকে আমরা অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র সীমার মধ্যে বন্ধি। তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল শিক্ষায় ছেলে মেয়েদের নিয়োজিত করা খুবই কষ্টকর।

বৃত্তবানরা দেশীয় শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে চান না বিদেশী অনুকরণে ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলছেন। যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশীয় শিক্ষার সাথে মোটেই যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাতৃভাষায় রূপদান করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। যে সমস্ত উপাদান শিক্ষার মান উন্নয়নে অন্তরায় সেইগুলি পরিহার করতে হবে।

এক রিপোর্টে জানা যায় দেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় দু'হাজার উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বিদেশে পারি জমাচ্ছে। অথচ একটি দেশকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য মেধাবী পরিশ্রমী ও উদ্যোগী জনশক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের একটি দারিদ্র্যপীড়িত কিন্তু সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে দেশের উন্নয়নে তারা কাজে আসবে। আমাদের মনে রাখতে হবে মেধাবী ছাত্ররা হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দেশের প্রয়োজনে তাদেরকে দেশে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের সমস্যার শেষ নেই তারপর ও আমাদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ আলমগীর কবির পাটওয়ারী "শিক্ষার মান উন্নয়নে কতিপয় সম্ভাবনা" প্রবন্ধে লিখেছেন :

"সত্যিকার অর্থে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মানব সম্পদ তথা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই, যার অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক। বর্তমানে মফস্বল পর্যায়ে কোটি কোটি জনসংখ্যার বিশাল পরিসরে এর মান ও গুণগত অবস্থা কতটা নাজুক তা আমাদের অনেকেরই জানা। মাঝে মাঝে মনে হয় বিরাট অংশে গুণগত মানের দিকে তাকাবার কেউ নেই। অধিকাংশ কার্যক্রম যেন দায়সারাগোছের। অথচ জনগোষ্ঠীর বিশাল সন্তানদের বিরাট অংশকে দেশ তথা জাতির স্বার্থেই দক্ষ করার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। তবেই অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অর্থবহ হবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরাট অংশে এক সময়কার গরীব মা-বাবার সন্তানরাই বর্তমানে নানা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িত। কিন্তু বর্তমানে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মানের যে পার্থক্য রচিত হচ্ছে এক সময়ে দেখা যাবে মফস্বল থেকে আর ভাল মানের শিক্ষার্থী ওপরে উঠে আসতে পারছে না, প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। এর উত্তোরণ ঘটাতে হবে।"

শিক্ষাকে মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার বিষয়ে আমাদের গুণগত শিক্ষা অর্জন করতে হবে। গুণগত শিক্ষা সম্পর্কে ইউনেসকো তিনটি দিক পর্যালোচনা করেছে।

প্রথমতঃ গুণগত শিক্ষা শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন ফলপ্রসূ কর্ম সম্পাদন দক্ষতাকে বুঝায়।

দ্বিতীয়তঃ নির্ধারিত মানসম্পন্ন কর্মসম্পাদন দক্ষতার অভাবকে শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি হিসেবে ধরা যায়।

তৃতীয়তঃ গুণগত শিক্ষা শিশু এবং তরুণদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির সহয়াক এই প্রসঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক ১৬ জানুয়ারি ২০০৪ জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন,

"সু-শিক্ষার কোন শেষ নেই। এটা একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা।"

একটি দেশের শিক্ষার মানউন্নয়নে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকাই শেষ নয়। এর সাথে আরও যারা জড়িত তারা হলেন মাতা পিতা কিংবা অভিভাবক। এই সম্পর্কে ইংরেজ কবি শেলীর উক্তি ঃ Mother is the best teacher of your child. অবশ্য সম্রাট নেপোলিয়ান মাতৃ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

"আমাকে একজন ভাল এবং শিক্ষিত মা দাও। আমি একটি ভাল জাতি দেব।"

বিদ্যালয় হচ্ছে একটি শরীর আর হৃদপিন্ড হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রক শিক্ষক। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে এখন আর আগের মতো মানসম্পন্ন পাঠদানের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণীকক্ষগুলো মনিটারিং করার কথা থাকলেও প্রধান শিক্ষক সাহেব চেয়ার ছেড়ে যেতে চান না।

শিক্ষার্থীর দৈনিক উপস্থিতির উপর শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পাঠোন্নতি হয়। শিক্ষার্থী ঠিকমত বিদ্যালয়ে আসল কিনা তা অবশ্যই শ্রেণী শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। কিন্তু আজকে সেই পরিস্থিতি নেই। স্কুলে আসুক আর না আসুক। বাড়ীতে কিংবা কোচিং সেন্টারে তো আসবে।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় খাতা ডায়েরী বাড়ীর কাজ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্বের কথা থাকলেও শিক্ষকের সেদিকে খেয়াল নেই।

শিক্ষার্থীদের Home work class work, class test- এর ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হবে এবাং বাড়ীর কাজে আগ্রহী হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা নাই বললেই চলে।

আমাদের দেশে শিক্ষক-অভিভাবকের মধ্যে সু-সম্পর্কের অভাব রয়েছে। অভিভাবকরা ফলাফল খারাপ হলেও শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করতে চান না। ফলাফল কার্ড হাতে পেলে স্বাক্ষর করা ছাড়া তার আর কোন দায়িত্ব নাই। অথচ প্রমোশনের সময় তিনি ঠিকই যান। যখন ছেলেমেয়েরা ফেল করে তখন আর তাদের মাথা ঠিক থাকে না।

শিক্ষকতা একমহান পেশা। আমাদের দেশে ভাল শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এই পেশার অবশ্যই মেধাবী অভিজ্ঞ এবং যোগ্যতা সম্পূর্ণ প্রার্থীকে নির্বাচন করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও হযবরল অবস্থায় আছে। শিক্ষা ব্যবস্থা যখন ত্রুটিপূর্ণ তেমনি পরীক্ষা পদ্ধতিও অনুন্নত।

শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি দিন দিন বেড়েই চলছে। টাকা না হলে ফাইল চলে না। দুর্নীতি পরায়ন লোকদের শাস্তিদানের ব্যবস্থাও নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হচ্ছে একটি গাছের শেকড়ের মতো যা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বুনিয়াদ। এই পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থীর শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হলে সে উচ্চতর শিক্ষাখাতে ও ভাল করবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যাপক 'আলমগীর কবির "প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই" প্রবন্ধে লিখছেন, "আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে তিনটি স্তর রয়েছে সেখানে শিক্ষার মান অতি নিচু। প্রথমে নিচু হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে তারপর সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।"

আমাদের দেশে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে প্রায় ২,৩ মাস চলে যায়। তার প্রধান কারণ হলো সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের আলো দেখতে পায় না।

আমাদের দেশে শ্রেণীকক্ষে ফলপ্রসূ পাঠদানের অভাব দীর্ঘ দিনের। মায়ের ক্রোড়ে শিশুকে যেমন মানায় তেমনি অন্যের ক্রোড়ে মানায় না। ঠিক তেমনি একজন শিক্ষক যে বিষয়ে পারদর্শী সেই বিষয়টাকে পড়াতে হবে। অথচ বিদ্যালয়গুলোতে অনিয়মের শেষ নেই। প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছে মতো রুটিন করার ফলে অনেক দক্ষ শিক্ষক তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পড়াতে পারে না।

আমাদের দেশে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের (ক) তে সন্নিবেশিত রয়েছে শিক্ষা জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা। ১৭ (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য (গ) 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গিকার মৌলিক অধিকারে পরিণত করা হলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার ঘোষণা সংবিধানে থাকলেও তা পালন করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদেরকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ

www.pathagar.com

কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসংস্থান ও রোজগারের উপায়। শিক্ষা মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণের এক রকম বিনিয়োগ। এ সত্যটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই জরুরী কাজ। দরিদ্র মানুষ চায় এখনই তার সমস্যার সমাধান, সন্তানের সামান্য শ্রমশক্তি বিক্রি করে সংসারের অভাব মোচন। শিশুর শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ পুঁজি করা গরীব মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার প্রয়োজন শিশুটির আয় হতে এ মুহূর্তে ক্ষুধা নামক দানবের হাত হতে বাঁচার কিছুটা সময় পাওয়া ও চেষ্টা করা মাত্র।

শিক্ষার বাজেট বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে অশিক্ষিতের হারও সমান তালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার পরিমাপ উর্দ্ধোমুখী হচ্ছে। কোথাও কোন জবাবদিহিতা নেই। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কোন নিয়ম নীতি নেই বললেই চলে, লোক দেখানো সংস্কার প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায়। কোথাও বাধা আসবে না, কারণ ক্ষমতা শুধু মুখেই জনগণের, প্রকৃত পক্ষে লুটেরাদের।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুব একটা শক্তিশালী নয়। এ ব্যাপারে কিছু ভাল স্কুল বাদ দিলে মফস্বলের অধিকাংশ স্কুলে দুরব্যবস্থা বিদ্যমান। অটো প্রমোশনের মাধ্যমে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্লাশ ডিঙ্গায় বলে এস এস সি পাবলিক পরীক্ষার ফেলের হার বেশি।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা যে উন্নয়নের জন্য মোটেই উপযোগী নয় বিভিন্ন গবেষণায় তা সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনে সামান্য সাহায্য করলেও উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের প্রাথমিকভাবে মেধা যাচাই করে পরিলক্ষিত হয় যে, সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। প্রাইমারী সেকেন্ডারী স্তরের এ অবনমন উচ্চ শিক্ষাস্তরে শিক্ষার মান ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। 'বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার মান' সম্পর্কে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন লিখেছেন :

"উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো উপযুক্ত শিক্ষকের নিশ্চয়তা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট শিক্ষকদের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পি. এইচ. ডি ডিগ্রীধারী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজসমূহে উচ্চতর ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অল্প। বর্তমানে যে সব শিক্ষক উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাচ্ছেন, তাঁদের ফেরত আসাটাও ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংকট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু, শিক্ষক নিয়োগে দলপ্রীতি, জেলাপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি উন্নতমানের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।"

উচ্চ শিক্ষার মান যথোপযুক্ত রাখতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক, গ্রন্থাগার, গবেষণা জার্নাল, সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরী অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই বেতন-ভাতা প্রদানে খরচ হয়ে যায়। অতি সামান্যই শিক্ষার উপকরণের জন্য ব্যয় করা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাবে ব্যবহারিক কোর্স পরিচালনা করা ক্রমশই দুরুহ হয়ে পড়ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহের অবস্থা আরো ভয়াবহ।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কিংবা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরীতে নতুন সংস্করণের বইয়ের তীব্র অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝেও লাইব্রেরীতে পাঠোভ্যাস একেবারেই অনুপস্থিত। ফটোকপির ওপর নির্ভরশীলতা ছাত্রদেরকে বইপড়া থেকে আরো নিরুৎসাহিত করছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার মানসিকতা। 'এ' লেভেল পর্যায়ে যে ধরনের বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন হয়, তা আমাদের অনার্স লেভেলের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় পযায়ে প্রশ্নপত্র রচনায় বহিঃপরীক্ষকের প্রশ্ন করার ট্র্যাডিশন থাকলেও প্রায়শঃই কোর্স শিক্ষকের প্রশ্নপত্রের প্রায় ৮০ ভাগই মূল প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার শুধু অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকই প্রশ্ন করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যেভাবে পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে, তাতে ভালো গ্রেডে উত্তীর্ণ হওয়া আদৌ কোন সমস্যা নয়।

যেকোন শিক্ষা ব্যবস্থার মান নির্ণয়ে পরীক্ষা বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূল্যায়নই পরীক্ষার যথার্থ ভূমিকা। উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে কিংবা ব্যবহারিক/ সেশনাল পরীক্ষাগুলোতে বহিঃপরীক্ষক রাখার ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর্থিক ব্যয় ও ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বার্ষিক পদ্ধতিতে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিটি বিষয়ে একজন বহিঃপরীক্ষক মুল্যায়ন করেন।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের (১৯৯২) এক সমীক্ষায় দেখা যায়–

"বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিকজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের অপরাদর্শী। কাজেই তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ও সামাজিক চাহিদা পূরণে তেমন সক্ষম নয়। আরেকটি জরিপেও (১৯৯৫) দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষা বাংলাদেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতকে প্রযুক্তিভিত্তিক ও সাধারণ এই দুই ভাগে যদি ভাগ করা যায় তবে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার মান খানিকটা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত। দেশ বিদেশে আমাদের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় ভাল করেছে। কাজেই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া একটি সামাজিক চাহিদা।"

[বাংলাদেশ শিক্ষা সংকট ও সম্ভাবনা ড. আতিউর রহমান]

বাংলাদেশে একটি দরিদ্র দেশ। পৃথিবীর ঘন বসতি অঞ্চলসমূহের একটি হলো বাংলাদেশ। এদেশে কোন খনিজসম্পদ নেই। কাঁচামালের পরিমাণ ও প্রচুর নয়। আমাদের জনসমষ্টি। আমাদের জমি, আমাদের জল একমাত্র সম্পদ। এদেশে যদি বেঁচে থাকার মতো একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই তাহলে একজন নাগরিক যে কর্মময় ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়টিকে অবশ্যই আমাদের সর্বাগ্রে বিবেচনা আনতে হবে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলতে হয়। সত্যিকার অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষা যেভাবে চলছে এভাবে চলতে পারে না। একথা সত্য যে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা আছে। কিন্তু ধর্ম নিরপ্রেক্ষতা আর বেকার এবং অকর্মালোক তৈরি করা কিছুতেই এক হতে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আহমদ ছফা লিখেছেন ঃ

"মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতির একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং এই শিক্ষা পদ্ধতিতে যদি কোন পরিবর্তন আনতে হয়, এই পরিবর্তনের দাবিটি সেই বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের মধ্য থেকেই সর্বপ্রথম আসতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষক এবাং ছাত্ররা যদি পরিবর্তন না চান তাহলে ওপর থেকে শুধুমাত্র একটা পদ্ধতির চাপিয়ে দিয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা যাবে না। এরকম ধারণা পোষণ করা অনেকটা কোম্পানীর নামান্তর এ পর্যন্ত কোথাও শোনা যায়নি যে, মাদ্রাসার শিক্ষা কিংবা ছাত্ররা মাদ্রাসা পদ্ধতি পরিবর্তনের কোনো দাবী করেছেন।"

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার গুণগত মানের কথা চিন্তা করলে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হয় শিক্ষার নামে কি চলছে স্বাধীন বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা ব্যবসা। আজকের শিশু যদি আগামী দিনের জাতির কর্ণদার হয়ে থাকে তাহলে কেন এদেরকে ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকহীন, শেকড়বিহীন এই সমস্ত কিন্ডার গার্টেনগুলো এদেশে আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে। ৮ম শ্রেণী পাস কিংবা এস. এস. সি. পাশ করেও অধ্যক্ষের খেতাবী লাভ করা যায় এখানে খুব সহজে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিদেশী বইয়ের প্যাকেজ। এর সুবাধে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি হাতিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ।

কোন রকম নিয়ম নীতি ছাড়াই গড়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোচিং সেন্টার। শিক্ষিত বেকার যুবকদের পাশাপাশি নেমেছে এক শ্রেণীর সরকারী-বেসরকারী সকল কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষক। প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত শিক্ষা না দিয়ে তারা কোচিং সেন্টারের নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ বিজ্ঞান শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নাই, বললেই চলে। স্কুল-কলেজে সঠিকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। স্কুলের ল্যাবরেটরীগুলোতে সঠিকভাবে বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে না।

পলিমাটির দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এদেশের মাটিতে সোনা ফলে। এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্বের সকল দেশের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। কৃষি নির্ভর এদেশে গুণগত শিক্ষার বিকল্প নেই। আসুন আমরা গুণগত শিক্ষা অর্জনে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করি।

দেশের প্রতিটি ভবিষ্যৎ নাগরিকের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ তথা জাতি গঠনে গুণগত শিক্ষা অর্জন করতে হবে। কিন্তু কিভাবে সেই শিক্ষা অর্জন করা যায়। এই প্রসঙ্গে জনাব কবির আহমেদ "জাতি গঠনে সুশিক্ষা" প্রসঙ্গে লিখেছেন।

গুণগত শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান ঃ

ক. পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক

খ. প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষাসরঞ্জাম এবং ভৌত অবকাঠামো সুবিধা।

www.pathagar.com

গ. শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন এবং পূর্ণ পরিকল্পনার মাধ্যমে যথার্থ পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ।

ঘ. ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান গবেষণা এবং উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা যাতে বছরের শুরুতেই পাঠ্য পুস্তকাদি পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রেণী কক্ষে ফলপ্রসূ এবং তথ্য নির্ভর পাঠদান কার্য নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক মনিটারিং করতে হবে।

শিক্ষার্থীর দৈনিক উপস্থিত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর খাতা ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভুলভ্রান্তি বিশেষ কালির কলম দিয়ে শুদ্ধ উত্তর লিখে দিতে হবে।

শিক্ষক এবং অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অভিভাবকের সঙ্গে সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিবেন। বখাটে ছাত্রদের সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় খাতা ডাইরি বাড়ির কাজ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শিক্ষকতা এক মহান পেশা। সুতরাং এ পেশায় অব্যশই মেধাবী ছাত্রদের এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই এর জন্য মানসম্পন্ন বেতন কাঠামো গঠন করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনীকরণ করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিতে নতুন করে ফেলে সাজাতে হবে।

শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি পরপর কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অযোগ্য লোকদেরকে অবশ্যই অপসারণ করতে হবে।

শিক্ষকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তাদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন লেখা পড়ার পরিবেশ তৈরির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ সমস্ত পুরানো শিক্ষকদের রিফ্রেসার্স কোর্সের মাধ্যমে সময় উপযোগী করে গড়ে তোলতে হবে।

ক্লাসে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ থেকে বঞ্চিত না হয়।

শিক্ষক সমাজকে কান্ডারীর ভূমিকায় আসতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোনভাবেই শিক্ষার্থীরদের অসহায় বলা যাবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরির নামে উচ্চহারে ডোনেশন প্রথা বন্ধ করতে হবে। যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ পায়।

প্রাইভেট পড়ানোর নামে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন পত্র আগেই বলা যাবে না এতে একজন শিক্ষার্থীকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রাইভেট না পড়লে কমনম্বর বা ফেল করানো যাবে না।

নোট দেওয়ার নাম করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না।

যুগের চাহিদার আলোকে এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল রেখে আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নতুন করে সাজাতে হবে।

বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যা এবং ব্যাপক দারিদ্র্য পরিস্থিতি কথা চিন্তা করে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক উপায়ে ঢেলে সাজাতে হবে। এই জন্য মানসসম্পন্ন শিক্ষক বেতনাদি উন্নত শিক্ষা সূচী প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পর পরই মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিবেচনা করা দরকার। এই ক্ষেত্রে শিক্ষাসূচীর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। মৌলিক জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। এই জন্য অবশ্যই বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে হবে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। ফলে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার পরিবর্তে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই সকল দারিদ্র্য কর্মজীবী ছাত্রদের স্কুলে আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতা করা উচিত।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইউনেস্কো ও আই এল ওর সুপারিশ মোতাবেক শিক্ষকদের চাকরিবিধি সংশোধন করা, মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য অমানবিক ডানবল কাঠামো আদেশ বাতিল করা জরুরী।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা

মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল হাতিয়ার হলো শিক্ষা। তাই যুগে যুগে দার্শনিক চিন্তাবিদরা শিক্ষাকে বিবেকের মূল অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন ঃ শিক্ষা যখন মানুষের মনে কাজ করে তখন তার মনের অন্তর্নিহিত প্রদেশ থেকে সমস্ত অব্যক্ত গুণাবলী ও পূর্ণতা থেকে বের করে আনে। —*এডিসন*

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাগুলির প্রকাশ —*স্বামী বিবেকানন্দ*

শিক্ষা হলো মিথ্যার অপোনোদন ও সত্যের আবিষ্কার। —*সক্রেটিস*

মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও সুশীল সমাজ গঠনের মূলমন্ত্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। কেননা যে জাতি যত পড়ুয়া সে জাতির মেধা তত প্রখর। এবং সে জাতি তত উন্নত, জনাব জিল্লুর রহমান "জীবনব্যাপী শিক্ষায় গণগ্রন্থাগারের ভূমিকা" প্রবন্ধে লিখেছেন, গ্রন্থাগার তথা গণগ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের অফুরন্ত সময়ের ফসল হিসাবে গণগ্রন্থাগারের উৎপত্তি।

সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের জন্য মানুষের যেমন পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য তেমনি কৌতূহল অভিপসা আগ্রহ ও জ্ঞানের চাহিদা পূরণে প্রয়োজন শিক্ষা উপকরণ আর সেই শিক্ষা উপকরণ যথাযথভাবে পাওয়া যেতে পারে গ্রন্থাগারে।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের স্মৃতিময় ঘটনা জড়িয়ে আছে গ্রন্থাগারে। সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পালাবদলের সাথে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় যুগে যুগে মানব সমাজে জ্ঞান চর্চার প্রবাহমান ধারা চিরন্তন।

শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম বাহন হচ্ছে গ্রন্থ। আর গ্রন্থাগার হচ্ছে তার মিলন মেলা। জনাব মোঃ আবু সাঈদ "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার একটি চেতনা" প্রবন্ধে লিখেছেন :

"জ্ঞান ও আনন্দ এ দুইয়ের প্রবাহ গ্রন্থের ভিতর দিয়ে নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলছে। আমাদের আবশ্যিক জিনিসগুলোর মধ্যে একটি অতি সুলভ কিন্তু অসাধারণ উপকরণ। গ্রন্থ আমাদের পরম বন্ধু। গ্রন্থ মানবকুলের চিন্তার প্রসার ঘটায় বুদ্ধি বৃত্তি তীক্ষ্ণ করে। জ্ঞানের গভীরতা বাড়ায়। মানুষকে সংশোধিত ও মার্জিত করে।"

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থল হল বিদ্যালয়। কিন্তু সে চর্চা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কখনও তার পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা যে কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করতে হলে শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অনেক বই পড়তে হয়। অনুসন্ধিৎসু মনের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে এবং জ্ঞান-

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের নতুন দিকের সাথে পরিচিত হতে হলে নতুন নতুন বই পড়া প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে দেয়া শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ। আর শিক্ষার্থীদের সেই বর্ধিত জ্ঞান পিপাসা মেটানোর জন্য প্রয়োজন বই আর বই। আগে সেই বইয়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই প্রয়োজন গ্রন্থাগার কিংবা পাঠাগার। যদি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বা পাঠাগার না থাকে তাহলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে যায়। কারণ ব্যক্তিগতভাবে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে তার জ্ঞান পিপাসা মেটানোর মত বিপুল সংখ্যক বই ক্রয় বা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্যেও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনিস্বীকার্য।

আসলে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পাঠাগার এবং গ্রন্থাগার বলতে যা বুঝায় তা হল কয়েকটি ভাঙ্গা অব্যবহার্য আলমারীতে রাখা বহু পুরোনো, জরাজীর্ণ কিছু বই। এমনকি সেই আলমারীগুলো রাখা হয় বিদ্যালয়ের অব্যবহার্য সবচেয়ে ছোট, সংকীর্ণ, আলো বাতাসহীন গুদাম ঘরের মত স্থানে কিংবা প্রধান শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের নিকটে অন্যান্য শিক্ষকদের বসার কোন কক্ষে। সে ঘরে শিক্ষার্থীদের চলাফেরা, বই দেয়া সুযোগ বা নেয়া বা বসে পড়ার কোন সুব্যবস্থা থাকে না। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় আমাদের দেশের বেশির ভাগ যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যদিও বা নামে মাত্র গ্রন্থাগার আছে কিন্তু পাঠাগার নেই। কিন্তু বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন প্রত্যেক বছরই গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য কম হলেও ছু পরিমাণ অর্থ খরচ করা দরকার এবাং প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার থাকা আন্ত প্রয়োজন।

সুশিক্ষার জন্য শুধুমাত্র শিক্ষকের আলোচনা ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে লেখা পড়া সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং নানারকম বই পড়া ও ব্যবহারে উৎসুক্য এবং কৌতূহলী হতে হবে। এদিক থেকেও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের অধিক প্রয়োজন রয়েছে।

কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্যেই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের প্রয়োজন তা নয় বরং শিক্ষকের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা আরও অধিকতর। কারণ বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং উৎসুক্য শিক্ষার্থীর সকল সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেবার সামর্থ তাঁর থাকার দরকার। আর এজন্য শিক্ষককে নির্ভর করতে হয় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের ওপর।

প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার সাথে মিল রেখে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে সব সময়ই বই এবং পত্র পত্রিকা পড়তে হবে, প্রতিদিনই তাকে জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। তাইতো বলা হয়–"এক শিক্ষক সতত শিক্ষার্থী।" ফলে শিক্ষকের জন্য গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিহার্য। এছাড়া অনেক প্রশ্নের জবাব শিক্ষককে যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে দিতে হয় আর এর জন্য তাঁর প্রয়োজন হয় রেফারেন্স বইয়ের প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থাগার। পাঠাগার বা গ্রন্থাগার একটি জ্ঞান ভাণ্ডার এবং এতে সংরক্ষিত থাকে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জ্ঞানী গুণীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

গ্রন্থাগার অতীত ও বর্তমানের সেতু বন্ধন। এখানে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুসারে আপন প্রচেষ্টায় আত্ম-শিক্ষণের প্রক্রিয়ায় জ্ঞান আহরণের সুযোগ

www.pathagar.com

পায়। আধুনিককালে গ্রন্থাগার ছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনার কথা ভাবাই যায় না। গ্রন্থাগার বা পাঠাগার ছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনার অর্থ হল শিক্ষা তথা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচার করা, তাদের সঠিক জ্ঞান আহরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

অতএব পাঠাগার বা গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিদ্যালয় পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের স্থান ও পুস্তক নির্বাচন

আমাদের মত দরিদ্র দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষ এবং অন্যান্য কক্ষের অভাব রয়েছে। এ কারণে গ্রন্থাগার অথবা পাঠাগার বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বসার ঘরে অথবা প্রধান শিক্ষকের অফিসে একপাশে থাকাই স্বাভাবিক। বিদ্যালয় যত ছোট বা আর্থিক দিক দিয়ে যত অস্বচ্ছলই হোক না কেন তাতে গ্রন্থাগারের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য ভাল ব্যবস্থা করতে গিয়ে বা যথেষ্ট আলো বাতাস যুক্ত প্রশস্তকর জায়গার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আবার নীরব ও শান্ত পরিবেশের বিঘ্ন না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে পুস্তকের তাক ও আলমারীর কাছাকাছি টেবিল চেয়ার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখা যায় বেশির ভাগ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের দেয়াল ঘেঁষে বইয়ের আলমারী রাখা হয়। কোন পাঠাগারের আলমারী চার ফুটের চেয়ে বেশি উঁচু হবে না, চেয়ার, টেবিল হালকা ও মজবুত হওয়া ভাল। গ্রন্থাগারের আয়তন কমপক্ষে ৯০০ বর্গফুট হওয়া উচিত। এখন আলোচনায় আসা যাক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা পাঠাগারে পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে। এ ধরনের পাঠাগারে পুস্তক নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ পুস্তক ক্রয় করার সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ এমনকি ব্যক্তি বৈষম্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন যেসব বই ক্রয় করবে তার মধ্যে থাকে বিভিন্ন মহা-পুরুষদের জীবনী, সাহিত্য, কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, বিজ্ঞানের আবিষ্কার বিষয়ক কাহিনী, বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য বই, ভ্রমণ কাহিনী, বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক বই ইত্যাদি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা পাঠাগার পরিচালনা

ছোট বড় সকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ গ্রন্থাগার বা পাঠাগার হবে যথেষ্ট আলোবাতাসযুক্ত প্রশস্ত খোলামেলা, নীরব ও শান্ত পরিবেশের। সম্ভব হলে বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতির ব্যবস্থা করতে পারলে বেশ ভাল হয়। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, গ্রন্থাগার অথবা পাঠাগারের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সেখানে আপনা থেকেই মন পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট ও নিবিষ্ট হয়ে পড়ে।

বই পুস্তক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারী ও খোলা তাকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আলমারীগুলোর উচ্চতা যাতে চার ফুটের চেয়ে বেশি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

www.pathagar.com

গ্রন্থাগারের সাথে পাঠাগার সংযুক্ত থাকতে পারে। আবার একই কক্ষ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল চেয়ার বা লম্বা বেঞ্চের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রন্থাগার অথবা পাঠাগারের বই নির্বাচন করা প্রয়োজন। বই নির্বাচনকালে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, অভিরুচি, পছন্দ-অপছন্দ ও ব্যক্তি বৈষম্যের দিকে খেয়াল রাখা দরকার। এছাড়াও পাঠ্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির উপরও যথেষ্ট রেফারেন্স বইয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এমনকি এখানে বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কার অভিযান, ধর্মীয় বই, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, হাস্য কৌতুক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বই ইত্যাদি সংগ্রহ ও সরংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচন করা উচিত এবং নতুন বইয়ের খোঁজ রাখা ও তা ক্রয় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতি বছর বিদ্যালয় বাজেটে পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয় করার জন্য যতটুকু সম্ভব অর্থ বরাদ্দ রাখা দরকার। তাহলে দেখা যাবে ক্রমেই বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

পাঠাগারে বহুল প্রচলিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি রাখা প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশু সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাগুলো রাখা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

পাঠাগারের সমস্ত বই প্রথমে বিষয়ানুযায়ী ও পরে বর্ণানুক্রমিক লেখকের নাম অনুযায়ী ভাগ করে সমস্ত বইয়ের ইনডেক্স কার্ড তৈরি করতে হবে। তারপর বইগুলোর নাম স্টক খাতায় তালিকাভুক্ত করে ইনডেক্স অনুযায়ী আলমারী অথবা তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্ভব হলে গ্রন্থাগার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অথবা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। আর সম্ভব না হলে কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষকের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক উৎসাহী শিক্ষার্থী নিয়ে একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ মিলে গ্রন্থাগারটি পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাঠাগারসহ সার্বিক তত্ত্বাধানের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। সম্ভব হলে তিনি গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের বই পুস্তক গুছানো, পাহারা দেয়া ও দেয়া- নেওয়ার জন্য একজন সাক্ষর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন।

সাধারণত বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হবার দু'ঘন্টা আগে গ্রন্থাগার অথবা পাঠাগার খুলে দেয়া উচিত। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটি এবং বিশেষ পর্বের ছুটি যেমন– ঈদ, পূজা, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি ছুটি ছাড়া অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ছুটি, যেমন– শীতকালীন ছুটি, গ্রীষ্মকালীন ছুটি ইত্যাদি ছুটিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা পাঠাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

গ্রন্থাগারে একটি বুলেটিন বোর্ডের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে গ্রন্থাগারে সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারের পদ্ধতি পরিবেশন করা থাকবে। বিশেষ করে নতুন নতুন বই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এ বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জানাবেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থী এক সাথে কয়টি বই নিতে পারবে, কতদিন রাখতে পারবে, কোন্ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে সপ্তাহের কোন দিন বই দেয়া- নেয়া হবে ইত্যাদি সকল বিষয়ে সুচিন্তিত নিয়ম নির্ধারণ করে বিদ্যালয় বুলেটিন বোর্ডে লিখে রাখতে হবে।

গ্রন্থাগার থেকে বই ধার দেওয়ার জন্য Issue Register থাকবে। কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষক বই নেবার সময় এ Register খাতায় নাম লেখে স্বাক্ষর করবে এবং বই ফেরৎ দিলে খাতা থেকে তার নাম কাটতে হবে। বর্তমানে বই লেন-দেনের জন্য আরও সহজ পন্থার প্রচলন শুরু হয়েছে। সেটা হল কার্ড প্রথা। এক্ষেত্রে কার্ডে বইয়ের নাম এবং বিবরণ লিখে তারিখ ও সই দিয়ে বই লেন-দেন করা হয়।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠাগার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য পাঠাগারে বসে Assaginment তৈরির নির্দেশ দিয়ে পাঠ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বই পত্রের নাম বোর্ডে লিখে দিতে পারেন। এমনকি মাঝে মাঝে শিক্ষককে নিজের প্রয়োজন ছাড়াও পাঠাগারে যেতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা পাঠাগার ব্যবহার করছে কিনা তা দেখতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা পাঠাগার ব্যবহারে উৎসাহিত হবে।

এছাড়া প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষক নিজ নিজ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে একটি করে পাঠাগার ব্যবহারের জন্যে নোট বই রাখার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এ নোট বইতে শিক্ষার্থী কত তারিখে কোন বই পড়বে, তাতে সে বিশেষ কি কি জানতে পেরেছে বা কোন বিষয় তাকে আকৃষ্ট করেছে ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব মন্তব্য লিখে রাখতে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর (যেমন ১৫ দিন বা একমাস) শিক্ষার্থীর সে নোট বই চেক করে দেখবেন।

বিদ্যালয় পাঠাগারে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত বই পুস্তক পড়বে সে সম্পর্কে বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিষয়ের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশিত পাঠ directed reading দিতে পারেন। এতে করে শিক্ষার্থীরা পাঠাগার ব্যবহারে অধিক উৎসাহিত হবে।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা
সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমল

প্রাচীন কাল থেকে উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। বিশাল এই উপমহাদেশের উর্বর পলিমাটি, বসবাসের জন্য মনোরম পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদি বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে বারবার। একসময় তারা মরিয়া হয়ে উঠে সম্পদরাজী এই উপমহাদেশে প্রবেশের জন্য। একসময় তারা সুযোগ পেল উপমহাদেশের মাটিতে পা ফেলার। তখনি তারা ছলে বলে কৌশলে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে জেঁকে বসেছে উপমহাদেশের মাটিতে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি:) কতিপয় মুসলমান উপমহাদেশে প্রবেশের সুযোগ পায় একটি অভিযানের মাধ্যমে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করায় মুসলমানগণ উপমহাদেশের একাংশে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নেয়। এরপর মুসলমান সুলতানগণ প্রায় পাঁচশত চল্লিশ বৎসর উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাধান্য বজায় রেখে শাসন কার্য চালিয়ে গেছেন।

সুলতানী আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মভিত্তিক। তখন বিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়েছিল মসজিদ বা মন্দির সংলগ্ন। তখন দেশীয় শিক্ষা পরিচালিত হতো পাঠশালায় কিংবা টোলে। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা তথা ইসলাম শিক্ষা পরিচালিত হতো মক্তবে ও মাদ্রাসায়। রাজকীয় কিংবা অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তখন শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাঁরা প্রয়োজনীয় জমি ও মুক্ত হস্তে দান করত। সুলতানী আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রফেসর এ কে এম মোজাম্মেল হক 'শিক্ষার ভিত্তি' গ্রন্থে লিখেছেন :

"সুলতানগণ নিজেদের সভায় পণ্ডিত, কবি প্রভৃতিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে বৃত্তি ও জায়গীর দান করেছিলেন। সুলতানী আমলে কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁদের অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ "তাবাকাত-ই-নাসিরী," জিয়াউদ্দীন বারাণী "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী," সামস-ই-সিরাজ আফিফ "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। এ আমলের ইতিহাস রচনা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। এ ছাড়াও সুলতানগণ অনুবাদ সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভেষজ শাস্ত্রের একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। আলবেরুনীর মত মুসলিম মনীষী সংস্কৃতিতে শিক্ষা লাভ করে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হলে জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়।"

সুলতানী আমলে যে সকল সুলতানগণ শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদান পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তুলে ধরছি :

সুলতান মাহমুদ (১০০০-১০২৬)

আফগানিস্তানের গজনীর সুলতান মাহমুদের কয়েকবার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর রাজধানী গজনী ছিল। ইসলামি সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবিরের মতে, "ইতিহাসে মাহমুদের স্থায়ী আসন তাঁর শিল্পকলা এবং জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিহ্নিত হয়েছে।" ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য তিনি আহরণ করেন সত্য কিন্তু তা বহুলাংশে নিয়োজিত হয় গজনীকে পৃথিবীর অতুলনীয় ও সমৃদ্ধশালী স্বপ্নপুরীতে পরিণত করবার প্রচেষ্টায়। তাঁর দরবার ছিল তৎকালীন জ্ঞানী ও গুণীদের প্রধান মিলন কেন্দ্র।

সুলতান মাহমুদ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ দরবারে সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও স্থপতির সমাবেশ ঘটে। সুলতান মাহমুদের দরবারে কমপক্ষে চারশত কবি কাব্য সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। স্তুতিগাঁথা ব্যতীত স্বকীয়তার চাপ মণ্ডিত অসংখ্য কাসিদাও রচিত হয়। রাজকার্যে ও যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও সুলতান কাসিদা শুনতে পছন্দ করতেন। রায়ের একজন প্রখ্যাত কবিকে একটি কাসিদার জন্য তিনি চৌদ্দ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। অপরাপর কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফারুখি; মনুশিহর আস্‌জাদী।

কিন্তু সুলতান মাহমুদের দরবারে ফেরদৌসী ছিলেন অন্যান্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর অনবদ্য কাব্য রচনা দরবারে বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য কবিদের রচনাবলীর কদর কমে যায়। মহাকবি ফেদৌসীর কালজয়ী সৃষ্টি 'শাহনামা' (রাজা বাদশাদের ইতিহাস) তাঁকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করে এবং তিনি রাজ দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। কথিত আছে যে, সুলতান মাহমুদ কবিকে এই অমর কাব্য রচনার প্রাক্কালে ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু "শাহনামা" রচিত হওয়ার পর আয়ায নামক একজন প্রিয়পাত্রের প্ররোচনায় সময়মত তাঁর প্রাপ্য অর্থ দেননি এবং কবিকে ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হয়। বেদনা ভারাক্রান্ত মনে এহেন আচরণের জন্য সুলতানের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি একটি বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করেন। সুলতান কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যখন ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করলেন, তখন তাঁর মৃতদেহ দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সুলতান মাহমুদের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন আবু রায়হান আল বেরুণী। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম দখল করে আল বেরুণীকে গজনীতে নিয়ে আসেন। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও ইতিহাসে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লিখিত 'তাহফিম' এবং সুলতান মাহমুদের পুত্র

www.pathagar.com

মাসুদকে উৎস্বর্গকৃত পুস্তক 'কানুন আল মাসুদী' তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। তাঁর অসামান্য খ্যাতির মূলে ছিল ভারত বর্ষের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, দর্শন, সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি। ভারতে অবস্থান করে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং তৎকালীন হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির ওপর 'কিতাব আল হিন্দ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তদানীন্তন হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহ, পৌত্তলিকতা, রাজনৈতিক কোন্দল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। উপনিষদের দর্শনও তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাঁকে নিঃসন্দেহে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচনা করা যায়।

সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি গজনীতে এসে জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক বায়হাকী ও উত্‌বী দার্শনিক ফারাবী। উতবী ও বায়হাকীর রচনাবলীতে সুলতান মাহমুদের রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নির্ভুল এবং চাক্ষুস বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক লেনপুল বায়হাকীকে "The orental Mr. Pepys" অভিহিত করেন।

সুলতান মাহমুদ যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতদের সমবেত করে গজনীকে একটি সুসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার এবং জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে পরবর্তীকালে সেলজুক আমলে বাগদাদে সুপ্রসিদ্ধ নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গজনীর জাদুঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিচারে গজনীর সুলতান মাহমুদ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ন্যায় পরায়ণ, সুবিচারক, প্রীতিভাজন, বিদ্যোৎসাহী ও ক্ষণজন্মা সৈনিক ছিলেন। হাবীব যথার্থ বলেন, "উত্তর সূরীদের নিকট, তিনি সিত্যই ছিলেন কিংবদন্তীর রাজকুমার।"

শাহাবুদদীন মুহম্মদ গোরী (১১৭৪–১২০৬ খ্রিঃ)

শাহাবুদদীন মুহম্মদ গোরী ছিলেন ভারতে মুসলিম শক্তি ও সাম্রাজ্যের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রদূত স্বরূপ। সুলতান শাহাবুদ্‌দীন মুহম্মদ গোরী বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন দক্ষ সেনাপতি, রাজনৈতিক সংগঠক, স্বাধীনচেতা এক দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক এবং বিদ্যোৎসাহী, শিল্পী ও সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তিত্ব। তিনি জ্ঞানী গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ফখরুদ্দীন রাজীর মতো দার্শনিক ও পণ্ডিত এবং নিজামী উরজীর মতো ক্ল্যাসিকাল কবি তাঁর দরবারে শোভা বর্ধন করতেন। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ নামে একজন বিখ্যাত কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

তিনি শিল্প ও সাহিত্যের প্রশংসা করতেন। তিনি ইসলামি শিক্ষা, আইন ও ধর্ম-শাস্ত্র আলোচনার জন্য আজমীরসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। একমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে ১১৯২–৯৩ সনে বিখ্যাত 'কুয়াতুল-ইসলাম' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করন। বহু তুর্কী কৃতদাসকে

www.pathagar.com

তিনি লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্য পরিচালনার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত ক্রীতদাসগণই পরবর্তীকালে দিল্লীর যোগ্য সুলতানরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে সুলতান কুতবুদ্‌দীন আইবক, ইলতুৎমিশ ও গিয়াসুদ্‌দীন বলবনের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক এস, এম, জাফরের মতে, "ভারতীয় রাজা বাদশাহের মধ্য মুহম্মদ গোরীই সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ভারতে ইসলামিক শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপনে মুহম্মদ গোরীর স্থান অনস্বীকার্য"।

তিনি ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আজমীরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি আজমীরের আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদ, দিল্লীর কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ তৈরি করে মুসলিম স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও মাদ্রাসার মাধ্যমে তাঁর সময়ে শিক্ষাদান প্রচলিত ছিল।

সুলতান কুতবুদ্‌দীন আইবক (১২০৬– ১২১০)

বিদ্যা, বুদ্ধি, সমরকুশলতা ও দূরদর্শিতার দিক দিয়া বিচার করলে কুতবুদ্‌দীন ছিলেন উত্তর ভারতে বিজয়ী মুহাম্মদ গোরীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অনুচর। তিনি স্বীর প্রতিভা আর কর্মদক্ষতার ফলে অল্পদিনের মধ্যে মুহম্মদ গোরীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সেনাপতির পদ অলংকৃত করেন। ভারতের মুসলিম ইতিহাসে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন কোন সন্দেহ নেই যে মুহম্মদ গোরীর ভারত অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়া প্রভুর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

সুলতান মুহম্মদ গোরী মৃত্যুর পর ১২০৬ খ্রিঃ তাঁর ক্রীতদাস সেনাপতি ও জামাতা কুতবুদ্‌দীন আইবক দিল্লীর প্রথম আইনানুগ স্বাধীন সুলতানরূপে সিংহাসনে বসেন ও তথাকথিত দাসবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কুতবুদ্‌দীন ছিলেন জ্ঞানী গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তি। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্য রসিক সুলতান ছিলেন।

কুতবুদ্‌দীন ছিলেন ইতিহাসের দ্বিতীয় হাতেম। তাঁর দানশীলতার জন্য তাঁকে লাখো বক্স বা লক্ষ টাকা দানকারী বলা হতো। ঐতিহাসিক হাসান নিজামী ও পণ্ডিত ফখ্‌রে মোদাব্বির তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

কুতবুদ্‌দীন অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাই মসজিদেই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে "কুয়াতুল-ইসলাম' নামে একটি মনোরম মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত আজমীরের মসজিদকে আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া বলা হতো। মসিজদ সংলগ্ন মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকা ছিল সে যুগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

মক্তব ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সুরা, কেরাত, অক্ষরজ্ঞান ও কিছু লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়া হতো। আর মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষা স্তরের প্রতিষ্ঠান যেখানে কোরআন, হাদিস, ফেকাহ্, উসুল, সাহিত্য ও দর্শন শেখানো হতো। রাজ প্রসাদেরও ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ছিল।

www.pathagar.com

তিনি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে নতুন যুগের সূচনা করেন। দিল্লীর 'কুতুবমিনার' তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। বিখ্যাত সূফী কুতবুদ্‌দীন বখ্‌তিয়ার কাকির মাজারে তাঁর নাম অনুসারে এই মিনার স্থাপিত হয়। আজান দেয়ার জন্য উচ্চ স্তম্ভকে মিনার বলা হয়। তাঁর নির্মিত 'আড়াই দিন-কা ঝোঁপড়া' মসজিদটি সত্যিই মনোমুগ্ধ-স্থাপত্যের নিদর্শন। মিনারের নির্মাণ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। ১২১০ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই প্রচেষ্টা ও সাধনায় মুহম্মদ গোরীর স্বপ্ন সাধ বাস্তবে রূপায়িত হয়। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজকীয় অর্থানুকূল্য ও ভূমিদানের ব্যবস্থাও তাঁর সময়ে শুরু হয়। ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন, 'আইবক ছিলেন মহানুভব সুলতান। ভারতের ভূমিতে ইসলামি শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।'

সুলতান ইলতুৎমিশ (১২১১–১২৩৬ খ্রিঃ)

সুলতান কুতবুদ্‌দীনের ক্রীতদাস ও জামাতা আলতামাশ, ইতিহাসে যিনি ইলতুৎমিশ নামেই পরিচিত, ১২১১ খ্রিঃ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজের মতে, 'তাঁর মত ধর্মপ্রাণ, বিদ্বান, দানশীল এবং দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নৃপতি খুবই কমই ছিল।'

তিনি বিদ্যোৎসাহী, শিল্পানুরাগী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তাঁর সময়ে সাম্রাজের ইসলামি শিক্ষা দেয়ার জন্য বহু মক্তব, মাদ্রাস, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ফলে, রাজধানী দিল্লী ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মস্তবড় কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তাঁর দরবারে প্রসিদ্ধ আমীর খসরু ও ফখ্‌রুলমূলক ওসমানীর আগমন ঘটে। এছাড়াও বিখ্যাত দার্শনিক আমীর কুহানীও তাঁর আনুকূল্য লাভ করন। ফলে তাঁর সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটতে থাকে।

স্থাপত্য শিল্পেও তাঁর অবদান কম নহে। তিনি সুলতান কুতবুদ্‌দীন আইবক কর্তৃক নির্মিত 'কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ' ও আজমীরের 'আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়া' মসজিদের সংস্কারসাধন ও সম্প্রসারণ করেন। তিনি দরবেশ বখ্‌তিয়ার কাকীর মাজারে কুতবুদ্‌দীন কর্তৃক নির্মিত মিনারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন এবং তাঁর মাজারের পাশে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করেন। ইহা ইতিহাসে 'শামসী ফোয়ারা' নামে খ্যাত।

তিনি মৃত্যুর পূর্বেই নিজের সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। আগ্রার জমকাল মসজিদটি তাঁর অপূর্ব শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে। ভারতীয় মুদ্রার সংস্কার ও আরবিয় মুদ্রা প্রচলন তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬–১২৪০)

ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে রাজিয়াই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজিয়া তাঁহার অল্পকাল রাজত্বের মধ্যে শাসন কার্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে বিরল। তিনি ন্যায়, সততা, সুবিচার ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

ইলতুৎমিশের পুত্র কন্যাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় রাজিয়ার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাই ১২৩৬ খ্রিঃ সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর অযোগ্য পুত্রদের উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে তাঁর সুযোগ্য কন্যাকে সিংহাসনের উত্তরাদিকারী করে যান। রাজিয়াও তাঁর পিতার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর আমলে দিল্লীর সমৃদ্ধশালী মুইজী মাদ্রাসা যথেষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষা দীক্ষা ও গবেষণা কার্য পরিচালিত হত। সুলতানা রাজিয়ার সাড়ে তিন বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্তব, মাদ্রাসায় প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়ে গেছেন।

সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬–১২৬৬)

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ধর্মভীরু, অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহার নম্রতা ও অমায়িকতার সুযোগে অভিজাত সম্প্রদায়ই তৎকালীন ভারতের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি ছিলেন নামে মাত্র সুলতান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী গিয়াসউদ্দীন বলবন ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বলবন সুদক্ষ সেনাপতি ও অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে সুলতান নাসিরউদ্দীনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। নাসিরউদ্দীন বলবনকে 'উলুঘ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

নাসিরউদ্দীনের দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে সমসাময়িক ইতিহাসবিদ্‌দের রচনায় যথেষ্ট প্রশংসাবাদ রহিয়াছে। তিনি সুলতান হইয়াও দরবেশের ন্যায় জীবনাযাপন করিতেন এবং অবসর সময়ে কোরান শরীফ নকল করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। মিন্‌হাজ সুলতানের অধীনে এক উচ্চ রাজ–কর্মচারীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিন্‌হাজ তাঁহার রচিত তবকাত-ই-নাসিরী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থটি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সুলতান নাসিরউদ্দীনের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ব্যক্তিগত উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মভীরুতা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও দেশের শাসনকার্যে নাসিরউদ্দীন খুব সক্ষম ছিলেন না। তাই মন্ত্রী বলবনের উপর তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইত। বলবন অবশ্য শাসনকার্যের দায়িত্ব পালনে চরম দক্ষতা, পটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলবন আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি স্থাপন, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি যাবতীয় শাসনকার্য অত্যধিক দক্ষতার সহিত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি দেশের সকল জায়গায় কেন্দ্রীয় শাসনের প্রাধান্য বিস্তার এবং বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহী রাজা, জমিদার ও হিন্দু সর্দারগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিলেন এবং মেওয়াটিদের ক্ষমতা খর্ব করিলেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ মুসলিম ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। সুলতানা রাজিয়ার পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক পর্যায়ে ১২৪৬ খ্রিঃ নাসিরুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন ও দরবেশের মত জীবন যাপন করতেন। তাঁর সাদাসিধা জীবন যাপনের কারণে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়, আদর্শ ও অনুকরণীয়। তিনি নিজে

www.pathagar.com

একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, তিই শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি সরাসরি বিদ্বান ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করতেন। তাঁর রাজ দরবার কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও প্রতিভাবানদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। যেসব ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ। তাঁর লিখিত পুস্তকের নাম 'তবকাত-ই-নাসিরি'। লেখক বইটিকে সুলতান নাসিরুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন।

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৬ খ্রিঃ)

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে দিল্লী খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তাঁর পূর্বসূরীদের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সময়ে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে মধ্য এশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই সব শিল্পী সাহিত্যিক প্রাণ ভয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে আসে। সুলতান তাঁদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে তাঁর রাজদরবার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। যে সব সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমির খসরু, শেখ ওসমান তিরমিজি, শেখ বদরুদ্দিন আরিফ, আমীর হাসান, সৈয়দ মাওলা, বাহাউদ্দিন ও কুতবুদ্দীন বখতিয়ার প্রমুখ।

উদারপন্থী সুলতান বলবন তাঁর আমাত্যদের পরামর্শ দিতে গিয়ে বলতেন, "প্রতিভাবান, শিক্ষিত ও সাহসী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দয়া ও বদান্যতার সাহায্যে তাঁদের পোষণ করুন। তাঁরা যাতে আপনাদের রাজসভা ও রাজমন্ত্রের সত্যাসত্য প্রতিপাদন করতে পারেন সে সুযোগ সৃষ্টি করুন।"

সুলতান বলবনের মত তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণও বিদ্যানুরাগী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ শিক্ষিত পণ্ডিতদের নিয়ে দর্শন বিষয়ক আলোচনা করতে পারতেন। আর এভাবে তাঁর নেতৃত্বে একটি সাহিত্য সমাজ গড়ে ওঠে। এটি অল্পকালের ভেতর শিক্ষার জন্য একটি মূল্যবান মাধ্যমে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বারনী মন্তব্য করেন, "তরুণ যুবরাজের দরবার প্রায়ই সে যুগের শিক্ষিত, মার্জিত ও মেধাবী ব্যক্তিতে ভরে থাকতো। তাঁর প্রাসাদ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের সভায় পরিণত হয়েছিল। আমীর খসরু এসব সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করতেন। এখানে বিখ্যাত কবিদের কাব্য প্রতিভা ও মেধা নিয়ে আলোচনা চলতো। নিয়মিতভাবে 'শাহনামা' 'দিওয়ানে সেনাই' ও 'দিওয়ানে খাকানি' থেকে আবৃত্তি করা হত।"

বলবনের দ্বিতীয় পুত্র বুগরাখান নাট্যামোদী ছিলেন। তাঁর সমিতির সভ্যদের মধ্যে বহু সঙ্গীতজ্ঞ, নর্তকী, অভিনেতা ও গল্পকার ছিলেন। সভ্যরা প্রায়ই যুবরাজের প্রাসাদে মিলিত হতেন। সুলতান পরিবারের অনুকরণে আমীর ওমরাহ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানগণ এই সময় এ ধরনের বহু সংখ্যক সমিতি গঠন করেন। সমিতিগুলো শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ফলে বিশ্বের নানা স্থান থেকে বহু পরিব্রাজক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অন্যান্য পেশার শিল্পীরা তাদের শিল্প চর্চার জন্য ভারতে আসেন।

www.pathagar.com

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তিনি শুধু জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন নি, সে যুগের বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাও তিনি প্রবর্তন করেন। কবি আমীর খসরু তাঁর দরবারে অবস্থান করতেন এবং সরকার থেকে মাসিক এক হাজার 'টঙ্কা' পেতেন। তোঘলাকাবাদ থেকে মাইল খানিক দূরে পাহাড় শীর্ষে অবস্থিত 'নায়িকা-কিলে' নামক দুর্গটি নাকি প্রকৃতপক্ষে একটি কলেজ, যা তাঁর দ্বারা প্রথম নির্মিত।

তোঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক ছিলেন মধ্যযুগীয় সুলতানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। কলা ও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন। তিনি গভীর অধ্যয়নে রত থাকতেন ও বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্ক করতে ভালবাসতেন।

ঐতিহাসিক বারনির মতে, "মুহম্মদ বিন তুঘলক এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁকে খোদার অদ্ভুত সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং এরিস্টটলের মতো মহাপণ্ডিতেরাও হয়তো তাঁর কাছে হার মানতেন।" শিক্ষার জন্য তাঁর দান ছিল সীমাহীন। তাঁর বদান্যতায় দিল্লীতে বহু মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়। দিল্লী হতে সাতশত মাইল দূরে দৌলতাবাদে তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন। মওলানা শিহাব উদ্দীন দৌলতাবাদী, সাইদ আলী হামদানী, মওলানা ইবনে তাজ মুলতানী, মওলানা হারস সিরাজ উদ্দীন মুহম্মদ বিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মরক্কো দেশীয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর দরবারে নয় বছর কাজী হিসাবে কাজ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে সুলতানদের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কোরআন, সুন্নাহ, তর্কশাস্ত্র, গ্রীক ও মুসলিম দর্শন, গণিত, শরীর বিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

এ ছাড়া মুহম্মদ বিন তুঘলক কৃষি, ডাক ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়। আদিয়াবাদ দুর্গ ও জাহান ফকরায় স্থাপিত বেগমপুরী মসজিদ সুলতানের স্থাপত্য কীর্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১–১৩৮৮ খ্রিঃ)

ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ সালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরাধিকারী হিসেবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে অবদান তিনি রেখেছেন তার তুলনা বিরল। নিজে বিদ্বান ছিলেন তাই বিদ্বান ব্যক্তিদের কদর বুঝতেন। ইতিহাসের একজন উৎসাহী ছাত্র হিসাবে তিনি 'ফতুহাতে-ফিরোজশাহী' নামে তাঁর নিজের রাজত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য অকাতরে

www.pathagar.com

দান করতেন। তিনি পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের কাব্যের জন্য বৃত্তি ও অর্থ সাহায্য দিতেন। তাঁর দরবারে যে সব খ্যাতিমান ঐতিহাসিক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিরাজ আরিফ ও জিয়াউদ্দীন বারনী অন্যতম। 'মসনবীর' লেখক জালালুদ্দীন রুমী, মওলানা আলিম আনন্দপতি, কাজি আব্দুল কাদির ও আজিজুদ্দীন খালিদ খানির মত খ্যাতিমান ব্যক্তিরা ফিরোজ সাহের দরবারে নিয়মিত শোভাবর্ধনসহ জ্ঞান চর্চার সুযোগ পেতেন। তাঁরা ধর্মতত্ত্ব, ইসলামি আইন, ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শন বিষয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অসাধারণ অগ্রগতির কারণ এই যে, সুলতান নিজে একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিক্ষকদের তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিকগণ শিক্ষা বিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপকে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এতে শিক্ষা যেমন ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি এর দ্বারা বহু দক্ষ শিক্ষকও সৃষ্টি হয়েছে।

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক তাঁর সময়ে প্রায় ত্রিশটির মতো মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাতে বেতনভোগী দক্ষ অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফিরোজ শাহী মাদ্রাসার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই মাদ্রাসার সাথেই সংযুক্ত ছিল মসজিদ ও জলাধার। মাদ্রাসাটি সম্পূর্ণ আবাসিক হওয়ায় শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ পাশাপাশি একত্রে বাস করতে পারতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি সুযোগ হত। এখানে শিক্ষাদান সঠিক এবং পূর্ণভাবে চলতো। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বৃত্তি পেত। হযরত মাওলানা রুমী ছিলেন এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

সুলতান ফিরোজ শাহের সময় রাজকোষ হতে শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় করা হতো। ক্রীতদাসের শিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এদের ভাল মন্দ তদারক করার জন্য যেমন আলাদা কর্মকর্তা ও বিভাগ ছিলো তেমনি তাদের পেনসন ও এককালীন নগদ অর্থ দেওয়ার জন্য ছিলো আলাদা কোষাগার। এক সময় এর দ্বারা প্রায় আঠার হাজারের মতো ক্রীতদাস প্রকৃত শিক্ষা পেয়ে বিদ্বান, ব্যবসায়ী ও কারিগরে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপি এবং কোরআন লিখনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এরা করতে পারত। ফিরোজশাহের উৎসাহে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি জীর্ণ মাদ্রাসাগুলোরও সংস্কার সাধন করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী উল্লেখ করেন, "ফিরোজ শাহের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছিল এক নবতর অধ্যায়।"

সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ

হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁর রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল ঃ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ আলী মুবারককে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

www.pathagar.com

রাজ্যবিস্তার ঃ সিংহাসনে আরোহণ করার পর ইলিয়াস শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়াতে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করে ইলিয়াস শাহ প্রথমে ত্রিহুত এবং পরে নেপাল জয় করেন। তিনি চম্পারণ ও গোরখপুরও জয় করেন এবং বারানসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তিনি শক্তি বৃদ্ধি করে স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ফখরউদ্দীনের পুত্রকে পরাজিত করে তিনি সোনারগাঁওকে স্বীয় সাম্রাজ্যভূত করে নেয়। এভাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের একজন অধিপতি হলেন।

ফিরুয তুঘলকের বঙ্গ অভিযান ঃ মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরুয তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইলিয়াস শাহের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। ফিরুয তুঘলকের অভিযানের কথা জানতে পেরে ইলিয়াস শাহ তাঁর দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরুয তুঘলক রাজধানী পাণ্ডুয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ইলিয়াস শাহের পুত্রকে বন্দী করবার পর একডালা দুর্গ অবরোধ করলেন।

একডালা দুর্গের অবরোধ প্রত্যাহার ঃ বাইশ দিন দিল্লীর সৈন্যবাহিনী একডালা দুর্গ অবরোধ করে রইল। কিন্তু ইহা অধিকার করতে পারল না। অবশেষে ফিরুয তুঘলক অবরোধ প্রত্যাহার করে দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

কামরূপ বিজয় ঃ কামরূপ বিজয় ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ঐ বছরেই তিনি উহা অধিকার করেন। কামরূপ বিজয়ের পরেই ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়।

ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব ঃ বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান যিনি সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে যুক্ত বাংলার অধিশ্বর হয়েছিলেন। এ কারণেই ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আকিফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাংলা' খেতাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি নিঃসন্দেহে একজন কীর্তিমান পুরুষ।

রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় যোগ্যতার বলে ইলিয়াস শাহ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তিনি শুধু সিংহাসনে আরোহণ করেই ক্ষান্ত হননি। ত্রিপুরা, নেপাল, উড়িষ্যা, চম্পারণ, গোরখপুব, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে রাজ্যসীমাও বিস্তৃত করেন।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ঃ ইলিয়াস শাহ ছিলেন একজন সাহসী ও উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তিনি কারও কাছে মাথা নত করেন নি। সুদীর্ঘ ১৫–১৬ বছর তিনি বিক্রমের সহিত বঙ্গদেশে তাঁর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ফিরুয শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। দিল্লীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করে তিনি বাংলায় রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করেছিলেন।

শাসন দক্ষতা ঃ শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও জনপ্রিয়। তাঁর শাসনামলে বাংলার শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। তাঁর আমলে স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

ধর্মনিষ্ঠা ঃ ইলিয়াস শাহ একজন ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি ফকির ও দরবেশগণকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। পীর সিরাজউদ্দীন ও শেখ বিয়াবানী তাঁর রাজত্বকালে এদেশে আসেন এবং তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেন। পীর সিরাজউদ্দীনের শিষ্য আলাউল হকের সম্মানার্থে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা ইলিয়াস শাহকে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলার ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়। তিনি বাংলা ভাষাভাষীদের সমন্বয়ে দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই বাঙালিরা সর্বপ্রথম একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হতেই রাজ্যের সকল অঞ্চলের অধিবাসী বাঙালি বলে পরিচিত হয় এবং বঙ্গের বাহিরের দেশগুলিও তাদিগকে বাঙালি বলে অভিহিত করে।

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৯৩–১৪১০ খ্রিঃ)

বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সিকান্দার শাহের সুযোগ্য পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ। ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সিকান্দার শাহ নিহত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের মসনদে বসেন। তিনি দক্ষ শাসক, বিদ্যোৎসাহী এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা শান্তি ও সংহতি বজায় রাখা ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্ভবত তিনি পিতার আমলে অধিকৃত কামপে অভিযান করে স্বীয় কৃতিত্ব কায়েম করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য ফারসি কবি এবং একবার তাঁর রচিত একটি গজলের শেষ অংশ পূরণের জন্য পারস্যের কবি হাফিজের নিকট পাঠান। তিনি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু হাফিজ নিজের অক্ষমতা জানিয়ে গজলটির শেষ দুটি ছত্র পূরণ করে পাঠান। পারস্যের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বে চীন সম্রাট ইয়াংলু ১৪০৮ খ্রিস্টাব্দে একটি চীনা মিশন বাংলাদেশে পাঠান। ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে আযম শাহ অনুরূপ একটি দল চীনে প্রেরণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁর আমলে প্রথম বাঙ্গালি মুসলমান কবি শাহ সগীর 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্য প্রণয়ন করেন। সম্ভবত তিনিই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনায় উৎসাহিত করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সমঝোতা রক্ষার প্রয়াস পান। তাঁর ন্যায়পরায়ণতার বহু নজীর আছে। একবার তিনি স্বয়ং আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক সূফী নূর-কুতুব-উল আলমের সমাধি নির্মাণ করেন। ইহাছাড়া মক্কা-মদীনায় তিনি অর্থ বিলির ব্যবস্থা করেন এবং মক্কায় মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। "বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধহয় আর কারও নাই। প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রে নানা রকম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে একটি

www.pathagar.com

উন্নত বৈচিত্রপ্রিয় রুচিবান বিদগ্ধ মানব-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বৈচিত্র্যময় যে, সেগুলি হতে তাঁকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়।" ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে আযম শাহের মৃত্যু হয় এবং সোনারগাঁয়ে (মগরাপাড়া) তাঁতে সমাধিস্থ করা হয়।

বাংলার হুসাইন শাহী বংশ (আলাউদ্দীন হোসেন শাহ)

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাবশী বংশের শামসউদ্দীন মুজাফফরকে পরাজিত ও বন্দী করে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বংশ হুসাইন শাহী বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। হুসাইন শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ প্রায় ৫৫ বছর (১৪৯৩-১৫৪৮ খ্রিঃ) বঙ্গদেশ শাসন করেন। হুসাইন শাহী বংশ বঙ্গের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ ঃ আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি প্রথমে শক্তিশালী প্রাসাদরক্ষী পাইকবাহিনীর ক্ষমতা বিনষ্ট করার জন্য তাদের অনেককে বরখাস্ত করেন এবং পাইকদের পরিবর্তে এক নতুন দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। অতঃপর তিনি আবিসিনীয় হাবশীদের নিয়ে পূর্ববর্তী সুলতানদের গঠিত সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিলেন এবং তাদিগকে বঙ্গদেশ হতে বিতাড়িত করে তাদের স্থানে পুরাতন অভিজাতগণকে (সৈয়দ ও আফগান বংশজাত লোক) নেয়া হল। এই ব্যবস্থার ফলে অল্পদিনের মধ্যে দেশে শান্তি ফিরি আসল।

জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ শারকী নিজ রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে পুত্র-পরিজনসহ বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ তাঁকে স্বীয় রাজ্যে বসবাস করতে অনুমতি দিলেন। বঙ্গের সুলতান জৌনপুরের সুলতানকে আশ্রয় দেওয়ায় দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী খুব ক্রুদ্ধ হন। দিল্লীর সৈন্যবাহিনী বঙ্গের সীমান্ত আক্রমণ করলে উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর দিল্লীর সেনাবাহিনী দিল্লীতে ফিরে যায়।

রাজ্য বিস্তার ঃ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে হুসাইন শাহ পূর্ববর্তী শাসনামলে যে সমস্ত স্থান হস্তচ্যুত হয়েছিল সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি কুচবিহারের কামতাপুরে অভিযান পাঠিয়ে উহা অধিকার করলেন। কামতাপুর বা কামরূপ বিজয়ের পর হুসাইন শাহ পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। অহোম নরপতি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমভূমি অঞ্চল মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হলে অহোম নরপতি পার্বত্য অঞ্চল হতে বের হয়ে আসলেন এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করলেন। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যা অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর পর হুসাইন শাহের সৈন্যবাহিনীর গোমতী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম অধিকার করে। আরাকান বিজিত হয় এবং তাঁর সেনাপতি পরাগল খান ইহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হুসাইন শাহের

www.pathagar.com

সামরিক অভিযান সম্বন্ধে ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, "আসাম অভিযান ব্যতীত হুসাইন শাহের সকল সামরিক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।"

হুসাইন শাহের কৃতিত্ব ঃ হুসাইন শাহ নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। শাসক হিসেবে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সুদক্ষ ছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ছাড়াও শিল্পকলা ও শিক্ষার উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি বঙ্গের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। তাঁর শাসনামলে বহু হাসপাতাল, মসজিদ ও বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামে দু'খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই যুগের কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, যশোরাজ খাঁ, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিপ্রদাস 'মনসা বিজয়' এবং বিজয়গুপ্ত 'পদ্মপুরাণ' (মনসামঙ্গল) রচনা করন। মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভগবৎ' ও 'পুরাণ' বাংলায় অনুবাদ করে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলেই বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তার লাভ করে। শিল্পকলা ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে অভাবিত উন্নতির জন্য হুসাইন শাহের শাসনামল বঙ্গের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হুসাইন শাহ পরলোকগমন করেন।

নসরত শাহ

হুসাইন শাহের মৃত্যুর পর নসরত শাহ ক্ষমতাসীন হন। তিনি পিতার ন্যায় একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি সিকান্দর লোদীকে পরাজিত করে তিরহুত অধিকার করেন। তিনি হাজীপুর অধিকার করে সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। পর্তুগীজদের দমন তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নসরৎ শাহ কূটকৌশল প্রয়োগে বাবরের আক্রমণ হতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করেছিলেন। ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ক্রীতদাস কর্তৃক নসরত শাহ নিহত হলে তাঁর প্রায় এক যুগব্যাপী গৌরবময় শাসনকালের অবসান ঘটে।

নসরত শাহের আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য নসরত শাহের শাসনামল গৌরবমণ্ডিত হয়ে রয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর আদেশে 'মহাভারত' ভাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। সুবিখ্যাত ' সোনা মসজিদ' ও 'কদমরসুল মসজিদ' তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তাঁর শাসনামলে জনসাধারণ শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্য দিন অতিবাহিত করত।

হুমায়ুন (১৫৩০-৩০, ১৫৫৫-৫৬)

দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের স্বল্পকালীন রাজত্বেও শিক্ষা চর্চা প্রসার লাভ করে। তিনি পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভূগোল ও বিজ্ঞান চর্চায় আনন্দ পেতেন। হ্যাভেল বলেন, "বাবরের মত তাঁর (হুমায়ুন) শিক্ষা এবং রুচি ছিল সম্পূর্ণরূপে ফার্সী ভিত্তিক।" তিনি জ্যোতির্বিদ্যা গণিতশাস্ত্র এবং কাব্য চর্চায় অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

www.pathagar.com

এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লাভ করেন। হুমায়ুনের রাজত্বে লিখিত জওহরের "তাজকিরাত-উল-ওয়াকিৎ" ও গুল বদন রচিত " হুমায়ুন নামা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে তিনি "দিনপানাহ" অর্থাৎ বিশ্বাসীদের আশ্রম নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি সুন্দর গ্রন্থাগার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গ্রন্থপ্রিয়। তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য অনেকগুলো গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। বাস্তবিক সদ্‌গ্রন্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতই তীব্র ছিল যে, এমনকি সামরিক অভিযানের সময়ও অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত কিছু সংখ্যক বই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কাউন্ড নোয়র জানান যে, তিনি ভারতবর্ষ থেকে পলায়নের সময় কিছু গ্রন্থও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত গ্রন্থাগারিক বাজ বাহাদুরকে তিনি সঙ্গে নেন। ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার রাজত্বের সময় শের মণ্ডল' নামক শের শাহের "প্রমোদ ভবন" তাঁর আদেশক্রমে গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়।

হুমায়ুন পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের মর্যাদার প্রতি ছিলেন খুবই সচেতন। সাম্রাজ্যে সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সম্রাটের পরে বিদ্বান ব্যক্তিদের স্থান ছিল নির্ধারিত। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দরবারে বিশেষভাবে সমাদৃত হন, তাঁদের মধ্যে খুদামির, জৌহর আবদুল লতিফ ও শেখ হুসাইন দিল্লী নগরীতে সম্রাট হুমায়ুন প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন।

হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল পছন্দ করতেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বিজ্ঞানের এ শাখাগুলোর যথেষ্ট উন্নতি হয়।

"দিন পানাই"র দরবারে জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক, সুফি, কবি এবং ঐতিহাসিকগণ সমাদৃত হতেন। মুঘল স্থাপত্য এবং চিত্রকলার উন্মেষ হয় হুমায়ুনের পৃষ্ঠপোষকতায়। পারস্য দেশ হতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন কালে হুমায়ুন মীর সৈয়দ আলী এবং খাওয়াজা আবদুল সামাদ নামে দুজন প্রখ্যাত পার্স্য দেশীয় চিত্রকরকে নিয়ে আসেন। এই দুজন চিত্রশিল্পীর উদ্দ্যোগে মুঘল চিত্রকলার বিকাশ ঘটে।

হুমায়ুন নারী শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে নারীদের শিক্ষিত, রুচিশীল, মার্জিত ও সংস্কৃতিমনা করার লক্ষ্যে তিনি ইরান, তুরান, সমরকন্দ ও বুখারা থেকে নামীয় বিশেষ গৃহ শিক্ষিকার মাধ্যমে শাহজাদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আরবি, ফারসি ও তুর্কী ভাষায় পণ্ডিত এ গৃহ শিক্ষিকারা সার্থকভাবে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। শাহজাদীদের শিক্ষার সুবিধার্থে হুমায়ুন পারিবারিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরব, ইরান, তুরান ও মিশর থেকে সংগৃহীত গ্রন্থাদিতে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, হুমায়ুনের ভগ্নি গুলবদন এ গ্রন্থাগারে ফেরদৌসী, হাফিজ, রুমি ও শেখ সাদীর অমর কাব্য ও কবিতা ইত্যাদি অধ্যয়ন করে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কাব্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটান। গুলবদনের রচিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'হুমায়ুন নামা'। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। গুলবদন শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি হেরেমের এতিম ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া ও ধর্ম শিক্ষা দিতেন।

সম্রাট হুমায়ুন অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং প্রতি সোমবার ও বুধবার সঙ্গীত চর্চার জন্য নির্ধারিত ছিল। তাঁর দরবারে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকারা বিশেষভাবে সমাদৃত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। গায়ক-গায়িকা ও যন্ত্রশিল্পীদের সুর মুর্ছনায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। শাদ বেগম ও মহরআংরেজ বেগম যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। মাণ্ডু দুর্গ অধিকারের প্রাক্কালে বাজু নামক একজন শিল্পীর সঙ্গীতের সুর লহরীতে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁকে তাঁর দরবারে গায়কের পদ প্রদান করেন।

নৃত্য-শিল্পীদের তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দেন এবং হেরেমে সাংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁদেরকে প্রধান প্রধান বেগমদের মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিত করেন।

হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল পছন্দ করতেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বিজ্ঞানের এ শাখাগুলোর যথেষ্ট উন্নতি হয়।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ)

বাংলাবর্ষ প্রবর্তনকারী সম্রাট আকবর মুঘল বংশের তৃতীয় সম্রাট। তিনি ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। মহামতি আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়ে থাকে। কারণ, বাবর প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সামাজ্য হুমায়ুনের রাজত্বকালে বিপর্যস্ত হলেও আকবরের কূটনৈতিক দক্ষতায় ও সমর কুশলতায় কেবল আফগান ষড়যন্ত্রই ধূলিসাৎ হয়নি, বরং বিজিত অঞ্চলগুলো সুসংবদ্ধ হয়। তাঁর রাজত্বকালে মুঘলগণ সামান্য আক্রমণকারী থেকে স্থায়ী ভারতীয় রাজবংশে রূপান্তরিত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে দুর্দমনীয় সৈনিক, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বিচক্ষণ প্রশাসক, জনহিতৈষী শাসক ও মানব চরিত্রের প্রকৃত বিচারক। তাঁর শাসনকে মুঘল আমলের "স্বর্ণযুগ বা অগাস্টান যুগ" বলা হয়।

সম্রাট আকবর নিরক্ষর বা উশ্মী ছিলেন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে আকবর সহি করতে জানতেন এবং তাঁর ধাত্রীমাতা মাহম-আনগা সুশিক্ষিতা ছিলেন বিধায় সম্রাট আকবর সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অপরিসীম ও স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রতিটি বিষয় জানার একটা কৌতূহল এবং সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা ছিল আকবরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি সুন্দর হস্তলিপি পছন্দ করতেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল প্রখর এবং যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তৃতীয় মুঘল সম্রাট মহামতি আকবর নিরক্ষর হিসেবে কথিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। উইলিয়াম স্লীমান বলেন, "কবিদের জন্য আগ্রার মতো লাহোরও বিদ্যা চর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ নগরীও সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পদচারণায় মুগ্ধ হয়ে উঠে। এখানেই 'তারিখ-ই-আল্‌ফি' লিখিত হয় এবং 'মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনী' ফার্সী ভাষায় অনুদিত হয়। লাহোরে অবস্থানকালে তিনি এ স্থানের বিদ্বান ব্যক্তিদের সাথে দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনা শুরু করেন। তাবাকত-ই-আকবরীর লেখক নিযাম উদ্দীন আহমদ ও রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমল এখানেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেন।

ফতেহপুর সিক্রী ঃ নতুন স্থাপিত ফতেপুর সিক্রীতে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ও শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ ইবাদতখানা নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ইবাদত

www.pathagar.com

খানায় সকল ধর্মাবলম্বীর পণ্ডিত সমাবেশে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা শুনতেন। ইহা ছিল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলন ক্ষেত্র। বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতাদর্শে বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আলোচনার প্রাক্কালে আকবর সত্য নিরূপণে সচেষ্ট হতেন। সম্রাট সব ধর্মের ভাল দিকগুলোর সমন্বয়ে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 'দিন-ই-ইলাহী' মতবাদের প্রবর্তন করেন। ইবাদত খানায় বিতর্ক সভার উদ্ভূত যে সব সমস্যা দেখা দিত সেগুলো যথাযোগ্য পরীক্ষণ ও সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষার প্রসারের প্রেক্ষিতে এসব পরীক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষাবিদদের নিকট কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

ইবাদতখানায় বিতর্ক কালে একদিন প্রশ্ন ওঠলো মানুষের আদি ভাষা সম্পর্কে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা তাঁদের স্ব স্ব ভাষা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সম্রাট আকবর সত্যিকার মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি বারটি শিশুর পরিচর্যার ভার দিলেন বারজন বোবা পরিচারিকার ওপর। তাদের বার বছর পর্যন্ত মানব সমাজ থেকে পৃথকভাবে বাস করার সুযোগ দেয়া হলো। বার বছর পর পণ্ডিত সমাবেশে শিশুদের এনে দেখা গেল তারা সকলেই বোবা, কোন ভাষাই তারা শিখতে পারেনি। শিশু কোন ধর্ম ও ভাষা সাথে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর যে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়-এ মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক সত্য এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ঃ আকবর জাতি সত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে ও জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে অসংখ্য মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বিত্ত সম্পত্তিও দান করেছিলেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। গরিব ছাত্রদেরও বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। এ সময়ে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় রাজা টোডরমল স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ফলে হিন্দুরা অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে ফার্সী ভাষা শিখে এবং মুসলমানদের সাথে মুঘল প্রশাসনের সর্বত্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে শুরু করে।

শিক্ষা সংস্কার ঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য আকবর কেবল মক্তব ও মাদ্রাসা বৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হননি, ফার্সী ভাষা শেখানোর জন্য তিনি নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতিও প্রয়োগ করেন। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থীকে ফারসী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার পূর্বে শিক্ষার্থীকে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হতো। প্রথম পর্যায়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে অক্ষর পরিচয় করানো হতো। অক্ষরগুলো এভাবে শিখে নিতে দু দিনের অধিক সময় প্রয়োজন হতো না। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্ত বর্ণগুলো কেবল শেখানো হতো। যুক্ত বর্ণগুলো আয়ত্ত করতে তাদের সপ্তাহ খানেকের মতই সময় লাগতো। সর্বশেষ পর্যায়ে স্রষ্টার প্রশংসাযুক্ত ছোট আকারের চরণ অথবা হিতোপদেশমূলক চরণ পড়তে দেয়া হতো। এভাবে শিক্ষকের দ্বারা শেখানোর পরে শিক্ষার্থীকে নিজের শ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে পড়তে সুযোগ দেয়া হতো। প্রয়োজনবোধে এ পর্যায়ে শিক্ষকরা সাহায্যও করতেন। শিক্ষার্থীকে পাঠের সংস্পর্শে রাখার জন্য প্রতিদিন অনুশীলনীর কাজ করতে বলা হতো। (১) অক্ষর, (২) যুক্তাক্ষর, (৩) অর্থশ্লোক অথবা

www.pathagar.com

দ্বিচরণ শ্লোক, (৪) পূর্ববর্তী পাঠের পুনরাবৃত্তির ওপরই তারা অনুশীলনীর কাজ করতো। ভাষা শেখানোর এ নতুন পদ্ধতি এতই কার্যকর হয়েছিল যে, ছাত্রদের ভাষা শেখার ব্যাপারে যেখানে কয়েক বছরের প্রয়োজন হতো, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যে ভাষা শেখা আয়ত্ত হতো। এ পদ্ধতির প্রয়োগ এতই কার্যকরী হয়েছিল যে, আবুল ফজল হিন্দুস্তানের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিনব শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতার প্রমাণ পেয়ে অত্যন্ত গৌরব অনুভব করেছিলেন। এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সংস্কার সাধনের জন্য আবুল ফজলও আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র।

শিক্ষাক্রম ঃ শিক্ষার্থীরা নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা অনুযায়ী যাতে বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে সেজন্য শিক্ষাক্রমের মধ্যেও বৈচিত্র আনা হয়েছিল। কিছুই শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো না। পরিষ্কার এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কাউকে বর্তমান বা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে এ ধরনের জীবনধর্মী শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে দেয়া হবে না এবং শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি অবহেলা দেখানো ঠিক হবে না। মানবিক ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হতো। যেমন-নীতিশাস্ত্র, গণিত, হিসাব, কৃষি, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, প্রশাসন পদ্ধতি, পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, সূক্ষ্ম অঙ্কশাস্ত্র, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ইতিহাস প্রভৃতি।

শিক্ষার লক্ষ্য ঃ সম্রাট আকবরের আমলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর শাসনামলে নিছক ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ভারতীয় ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতের জনগণকে সুসংহত করা। উদার মানসিকতা ও জাতীয় দৃষ্টি ভঙ্গির অধিকারী সম্রাট আকবর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর প্রজাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। হিন্দুদেরও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে সমভাবে শিক্ষা দেয়ার প্রথা চালু হয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "His views on educational matters were better and more tolerant than those of other Muslim rulers. He encouraged the study of sanskrit and extended his Patronage to Hindu scholars."

শিক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশ ঃ শিক্ষণ সম্পর্কে তাঁর একটি নির্দেশও উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর নির্দেশে বলেছিলেন যে, ছাত্ররা যাতে নিজেরা পড়ে পঠিত বিষয়টি সম্পর্কে নিজেরাই মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হয় তারই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এ উপলব্ধির পথে কিছুটা সাহায্য করবেন মাত্র। শিক্ষা সম্পর্কে আকবরের মতবাদ ও নির্দেশ অত্যন্ত প্রগতিশল এবং বাস্তব জ্ঞানের পরিচায়ক। বস্তুত মধ্যযুগীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় বর্ধিত হলেও আকবর কী করে এ প্রগতিশীল মন ও চিন্তার অধিকারী হয়েছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের বস্তু।

নব রত্ন সভা ঃ আকবর রাজ দরবারে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর নব রত্নসভার সদস্যগণ তাঁর দরবারে উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হিসাবে বিরাজ করতেন। তাঁরা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আকবর তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে প্রতিবার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

ছিলেন আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল মানসিংহ, তানসেন মোল্লা-দো পেয়াজা।

সঙ্গীত ঃ আকবর সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবুল ফজল আকবরের দরবারে ছত্রিশজন সঙ্গীত শিল্পীর উল্লেখ করেন। তানসেন ছিলেন তাঁদের শিরোমণি। আকবরের রাজত্বকালে বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণে ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব হয় এবং এতে তানসেনের অবদান অনস্বীকার্য।

তানসেন ঃ তানসেনের জন্ম ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে। দশ বছর বয়স থেকে তিনি স্বামী হরিদাসের অধীনে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। হরিদাস ছিলেন ধ্রু পদ গায়ক ও ধ্রু পদ রচয়িতা। ধ্রু পদের ক্রমোন্নতিতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তানসেন বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। গীত রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তানসেনের সঙ্গীত শিক্ষার পর্ব শেষ হয়। রেওয়ারের রাজা রাম তাঁকে সভাগায়ক নিযুক্ত করেন।

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর সম্রাট আকবর তানসেনকে দিল্লীর দরবারে প্রধান গায়ক নিযুক্ত করেন। আকবরের মতো বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ইতিহাসে বিরল। নানা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের প্রতি তিনি অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। আকবর নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দিল্লীর দরবারে তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞকে স্থান দেন। তানসেন ছিলেন তাঁর মধ্যমণি। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর দরবারকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত চর্চার এক বিপুল ধারা গড়ে ওঠে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশে সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা গভীরভাবে ফলপ্রসূ হয়।

দরবার জীবনে তানসেন যেমন অসামান্য কণ্ঠস্ব ও সুরের প্রভাবে গানকে জনপ্রিয় করেন তেমনি বহু শিষ্য তৈরি করে সঙ্গীত বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। আশি বছর বয়সে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুত্র, জামাতা ও শিষ্যগণ তাঁর সঙ্গীতের পতাকা বহনের সম্পূর্ণ যোগ্য।

তানসেনকে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের জনক বলা হয়। তিনি আধুনিক ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন গীতিকার ও কবি। তাঁর রচিত বহু গান পাওয়া যায়। 'রাগমালা' ও 'সঙ্গীত সার' নামে তিনি দুটি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তানসেন কতিপয় রাগ সৃষ্টি করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারস্যের সঙ্গীত ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে আমীর খসরু যে নব সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত করেছিলেন তানসেনের সাধনায় তারই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র ও কন্যা বংশ এবং শিষ্য বংশের মাধ্যমে সেই সঙ্গীত ধারা সারা উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে। হিসেবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশের ক্ষেত্রে তানসেনের অবদান অপরিসীম।

সাহিত্য ঃ সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আকবরের রাজত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সর্বদা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মপণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গদান করতেন এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্য ও হিন্দু সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর উদার ধর্ম

www.pathagar.com

সহিষ্ণু নীতি তাঁকে সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত করে এবং শিল্প সাহিত্যে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করে।

ইতিহাস ঃ আকবরের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনায় কয়েকজন পণ্ডিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা', মোল্লা দাউদের 'তারিখ-ই-আলফি', বদাউনীর 'মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ', নিযামুদ্দীন আহমদের 'তাবাকত-ই-আকবরী', ফেজী সরহিন্দির 'আকবরনামা', আবদুল বাকীর 'মা সীর-ই-রহিমা' প্রভৃতি ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাস থকে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম সদস্য ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ফারসি ভাষায় রচিত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। আইন-ই-আকবরী আকবরের রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর নির্ভরযোগ্য মূল্যবান, ঐতিহাসিক তথ্যের সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এতে তাঁর প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন যে, "ইহা ছিল দীর্ঘ ও নির্ভুল।" এ ছাড়া বদাউনীর "মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ।" এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রচনা। নিযামউদ্দীন আহমদের "তাবাকাত-ই-আকবরী" এবং নকীব খান, মোল্লা আহমদ, আসফ খানের যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত "তারিখ আলফি" ঐতিহাসিক রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

অনুবাদ ঃ পারস্য ভাষায় মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা ব্যতীত আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফৈজী, আবুল ফজল, বদাউনী সংস্কৃত ভাসায় বহু পারস্য গ্রন্থ, অনুবাদ করেন। এভাবে মহাভারত রামায়ণ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া অর্থর্ববেদ, ভগবৎগীতা, লীলাবতী ও রাজতরঙ্গিনী পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দর্শন সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও পৌরানিক কাহিনীও পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়।

শেরশাহ্ শূরী (১৫৪০–১৫৪৫ খ্রিঃ)

স্বীয় প্রতিভা, বাহুবল ও সমরকুশলী শেরখান ১৫৪০ সালে সম্রাট হুমায়ুনকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং শেরশাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি শূরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আব্বাস শেরওয়ানী কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শেরশাহের বাল্য জীবন সুখের ছিল না। বাইশ বছর বয়স থেকে গৃহ বিতাড়িত হয়ে শেরশাহ তৎকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র জৌনপুরে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করেন। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শেখ সাদীর রচিত গুলিস্তা, বুস্তাঁ এবং নিজামীর সেকেন্দ্রানামা মুখস্থ করে ফেলেন। জৌনপুরেই তাঁর এ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে শিক্ষা ও আনন্দ দুই'ই লাভ করেন। তিন বৎসরের মধ্যে শেরশাহ শিক্ষকের মর্যাদায় উন্নীত হন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জায়গীরদার। তাঁর ভবিষ্যত জীবনে ভারতবর্ষের শাসনের শিক্ষানবিশী অধ্যায় সূচিত হয় তাঁর পিতা হাসানের জায়গীর পরিচালনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

শেরশাহ শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মাণ করেন। শেরশাহ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতদের খুবই মর্যাদা দিতেন। তাঁদেরকে মুক্ত হস্তে অর্থ দান

www.pathagar.com

করতেন। শেখ আব্দুল্লাহ সুলতানপুরী মখদুম উল-মুলক ও আব্দুল হাসান কামবু নামে দু'জন নামকরা পণ্ডিত তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসাবে থাকতেন।

শেরশাহের সময়ে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা, আরবি, ফার্সীভাষা ব্যতীত আধুনিক শিক্ষাদানও করা হতো। মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করা হতো। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য যথাক্রমে ভাতা ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এ কারণে শেরশাহ বহু ভূমি সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। শিক্ষার উন্নতি কল্পে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে টোল, পাঠশালা, মঠ, বিহার, মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠে। তাঁর সময়ে দেশে নাগরী ভাষার প্রচলন ছিল তা তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রার উপর থেকে বুঝা যায়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি, ফারসি ও হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত। বিদ্যালয়ে উপদেশ দান, বিতর্ক, বক্তৃতা ও আলোচনার উপর প্রাধান্য দেয়া হতো। গ্রাম্য গীতানুষ্ঠান, কথকতা, মেলা প্রভৃতি লোক শিক্ষার উৎকৃষ্ট বাহন ছিল। এ ছিল তৎকালীন সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা, সাহিত্য, ফিকাহ্, গণিত, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না। হিন্দু শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি অনেক ভূমি দান করেন। মূলত তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত।

শেরশাহের স্বল্পকালীন রাজত্বে তাঁর স্থাপত্য শিল্প নিদর্শনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে রোটাসগড়ের দুর্গ, দিল্লীর পুরান কেল্লা, কিল্লা-ই-কুহনা মসিজদ এবং সাসারামে তাঁর সমাধি-সৌধ যা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব এর মতে, "সম্রাট আকবর অপেক্ষা শেরশাহ উদার ধর্মনীতিতে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সাফল্য প্রতিফলিত হয়।"

জাহাঙ্গীর (১৬০৫–১৬২৬)

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও শিল্প শিক্ষায় তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে শিক্ষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তিনি নিজে পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কবিতা তাঁর অত্যধিক প্রিয় ছিল এবং তিনি স্বয়ং কবিতা রচনা করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি ছিলেন সুধীজনের বিশ্বস্ত বন্ধু। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' ফারসি সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মির্জা গিয়াসবেগ, নাকিব খান, আবদুল হক দেহলবী।

প্রকৃতি প্রেম ও চিত্র কলার প্রতি তাঁর অসাধারণ মোহ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলার জাতীয় স্কুলের উদ্ভব হয় এবং মুঘল চিত্রকরগণ অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এ সময়ের প্রখ্যাত চিত্রকর ছিলেন মনসুর, আবুল হাসান প্রমুখ।

শিক্ষার প্রতি জাহাঙ্গীরের এতই অনুরাগ ছিল যে, সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই পাখি ও পশুর বাসভূমিতে পরিণত, প্রায় তিন যুগ ধরে পরিত্যক্ত ব্যবহারের অনুপযোগী মক্তব ও মাদ্রাসার সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছাত্র ও

www.pathagar.com

অধ্যাপকদের বাসের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ দেন। মৃত প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশক্রমে রাজকীয় গ্রন্থাগার অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকের সংযোজনে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়। মকতুব খান নামক একজন দক্ষ গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে এ গ্রন্থাগার ন্যস্ত করা হয়। তিনি একটি ফরমান জারি করেন যে, উত্তরাধিকারীহীন বিত্তশালী কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হবে এবং সম্পত্তির কিছু অংশের আয় সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হবে।

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৬৬)

বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয় শাহজাহানের রাজত্বকালে। শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষতা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য শাহজাহানের রাজত্বকে বিখ্যাত করে রেখেছে। শাহজাহান শৈশবে পিতামহ সম্রাট আকবরের স্নেহে লালিত হন এবং সুরুচি সম্পন্ন মনের অধিকারী হন। শাহজাহানের রাজত্বকালের শিক্ষা সম্পর্কিত বার্ণিয়ারের বিবরণ অজ্ঞতা প্রসূত, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, শাহজাহান একজন সংস্কৃতিবান নৃপতি ও মার্জিত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সব সময়ই যে কোন উৎস থেকেই আসুক না কেন সাহিত্য কর্মকে স্বীকৃতি দিতেন এবং সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করতেন। আমীন কাজউইনী (Amin Qazwini); আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি হচ্ছেন তাঁর দরবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর পিতা ও পিতামহ কর্তৃক গৃহীত নীতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমৃদ্ধি ছিল অব্যাহত। তাঁর আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে Mr. N.N.Law বলেন; "All the educational institutions, with their rich endowments, made by the previous emperors, nobles private gentlemen, continued unabated prosperityin his time."

সম্রাট স্বয়ং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'দারুল বাকা' নামক এক সময়ের জাঁকালো মাদ্রাসা তাঁর রাজত্বকালে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তিনি এটি পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং দিল্লীর প্রধান বিচারক মওলানা সদরুদ্দীন কাঁন বাহাদুরকে পুনঃনির্মিত 'দারুল বাকা' মাদ্রাসার পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রদের সার্থক শিক্ষাদনের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ রাজকীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বি, পি, সাকসেনার মতে, তিনি দিল্লী ও আগ্রাস্থ কলেজসমূহের শিক্ষক নিয়োগ করতেন।

সম্রাট সুন্দর হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাহিত্য ঃ শাহজাহানের দরবারে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন "পাদশানামার" রচয়িতা আবদুল হামিদ লাহোরী, "শাহজাহান নামার" রচয়িতা ইনায়েত খাঁন, "আলম শাহীর" রচয়িতা মুহাম্মদ সালেহ। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন

www.pathagar.com

আরবি, ফারসি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস, উদারপন্থী ও অমায়িক। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশা করতেন এবং বেদান্ত ইহুদীদের তালমুদ, খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ করতেন। তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তায় উপনিষদ ও অর্থবেদ ফারসিতে অনুবাদ করেন। এছাড়া দারাশিকো সফিনা আল আওলিয়া এবং মাজমূ-আল-বাহরাইন নামে দর্শন ও আওলিয়াদের ওপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সঙ্গীত ঃ সম্রাট একনিষ্ঠ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও রাগিনীর উদ্ভব হয়। যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেন যে, শাহজাহানের রচিত কতগুলো হিন্দি সঙ্গীত শ্রবণ করে দরবারে পূণ্যাত্মা সুফীগণ ভাব বিহবল হয়ে পড়তেন। তাঁর আমলের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে মুহাম্মদ সালিহ যদুনাথের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

চিত্রকলা ঃ হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলার উন্মেষ হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে এটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং শাহজাহানের রাজত্বে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর আমলে প্রতিকৃতি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। দারাশিকোর এলবাম শাহজাহানের আমলের চিত্রকলার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ফরিরুল্লাহ, মীর হাসান, অনুপ, চতর তাঁর চিত্রশালার পরিচালক ছিলেন এবং চিত্রমণি ছিলেন এ সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর।

আলমগীর (আওরঙ্গযেব) (১৬৫৮-১৭০৭)

শাহজাহানের পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন আওরঙ্গযেব। আওরঙ্গযেব একজন নিবেদিত প্রাণ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ মুসলিম হিসেবেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তাঁর রাজত্বকালে চিত্রশিল্প, স্থাপত্যকলা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিল। ঈশ্বরী প্রসাদের ভাষায়, 'কৃতি সেনাধ্যক্ষ এবং শাসক ছাড়াও তিনি একজন প্রকৃত অর্থে বিদ্বান ছিলেন।' তিনি মুসলিম ধর্মতত্ত্বের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং নীতিশাস্ত্র, আরবি ব্যবহারতত্ত্ব এবং ফারসি সাহিত্যও তিনি নিবিড়ভাবে চর্চা করেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব ছিলেন প্রখর মেধা শক্তি সম্পন্ন। তিনি সমস্ত কোরান শরীফ মুখস্থ বলতে পারতেন। তিনি স্বয়ং ফারসি ভাষায় চিঠি ও নথি পত্র লিখতেন। তিনি কবিতা রচনা করতে সক্ষম ছিলেন, তবে তা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, কবিগণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোরান শরীফ তিনি সিকাস্তা ও নাসতালিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করেন।

মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ সমগ্র সাম্রাজ্যে তিনি বহু সংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অধ্যাপকদের বেতন ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। পণ্ডিতদের যোগ্যতানুযায়ী তাঁদের ভূমি দানের ব্যবস্থাও করেছিলেন বলে জানা যায়। সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সমান মনোযোগী। বিশেষত গুজরাট প্রদেশের বোহরা সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি রাজকীয় ফরমান জারী করেন যেন প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল হন। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের পুরানো মক্তব ও মাদ্রাসা

www.pathagar.com

পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেন। তিনি গুজরাটের দেওয়ানকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যেন তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করেন। তাঁরই আমলে শিয়ালকোট একটি শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

রাজকীয় গ্রন্থাগার ঃ ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি আইনশাস্ত্র তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগারটিতে ইসলামিক আইন ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা বাড়ান।

ফতোয়া-ই-আলমগীরী ঃ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও আইনজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' মুসলিম আইনের ওপর নির্ভরযোগ্য আইন সংকলন। আইনজীবী ও বিচারকরা অদ্যাবধি মুসলিম আইনের উৎস হিসেবে এর ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। তথ্যবহুল এ গ্রন্থ তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।

কবি ও সাহিত্যিক ঃ তাঁর রাজত্বকালে বেশ কিছু সংখ্যক কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব শিক্ষা বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে। তাঁর রাজত্বকালে ৪৫ জন বিশিষ্ট কবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে সেরা কবি ছিলেন সরমদ। এ কবিদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন লাহোরের বাসিন্দা। তন্মধ্যে চন্দর ভূয়ান হচ্ছেন একজন হিন্দু কবি। এ সময়ে আবদুল আযীয, আবদুল্লাহ, আবদুল করিম শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

আলমগীর আওরঙ্গযেবের শিক্ষা দর্শন

শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা-সহনশীলতা, শাসন-প্রশাসন, যুদ্ধরীতি-কৌশল, দক্ষতা ও কর্ম নৈপুণ্য, সততা, নিষ্ঠা ও মহানুভবতা ইত্যাদি গুণের দিক থেকে আওরঙ্গযেব নিঃসন্দেহে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তিনি উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ও ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই নিজে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষা দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক দর্শনের অধিকারী ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষা দর্শনগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. শিক্ষা হবে বাস্তবমুখী, জীবনকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ঃ আওরঙ্গযেব যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিল পুঁথিগত বিদ্যা। আরবি ও ফারসি ব্যাকরণ চর্বিত চর্বন। এ শিক্ষা বাস্তব সমস্যার কোন সমাধান করতে পারতো না। তিনি আক্ষেপ করে যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর শিক্ষা দর্শনের রূপটি ফুটে উঠেছিল।

খ. শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ঃ আওরঙ্গযেব যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তাঁকে ভবিষ্যতে একজন সেনানায়ক, কুটনীতিবিদ ও রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে প্রস্তুত করেনি। তাই তাঁর সময়ে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রতি অভিযোগ করেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির ভিত্তি হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন।

গ. বৈষয়িক শিক্ষা ঃ শিক্ষা মানব সমাজের রীতি-নীতি, সমাজ ব্যবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাকে প্রতিফলিত করবে। এজন্য তিনি ইতিহাস, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

www.pathagar.com

ঘ. ধর্মীয় শিক্ষা ঃ শিক্ষা আত্মচেতনা, স্বদেশপ্রেম, নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করবে। এর ব্যবস্থা হিসেবে তিনি জাতীয় ইতিহাস, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি জোর দেন।

ঙ. মানব চরিত্র গঠনে সহায়ক ঃ শিক্ষা মানব চরিত্রের রহস্য উদঘাটন করবে। মানব চরিত্র ও তার জটিল রহস্যসমূহ আবিষ্কারের ওপর তিনি জোর দিতেন।

চ. শিক্ষা জগৎ ও জীবনের রহস্য উন্মোচন করবে ঃ বিশ্ব জগৎ ও এ পৃথিবীর প্রাণিজগতের মূল রহস্য সৃষ্টিতত্ত্ব তার কার্যকারণসমূহ উদঘাটন, জগৎ ও জীবনের মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি জটিলতর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াসমূহ আবিষ্কার করে মানুষের অন্তর্চক্ষুকে উন্মোচন করাই হলো শিক্ষার অন্যতম কাজ।

ছ. শিক্ষা হবে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ সৈনিক, সেনানায়ক ও সম্রাট হিসেবে তাঁর মধ্যে যে দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন ছিল তা তিনি শিক্ষকের মাধ্যমে লাভ করেন নি। অথচ বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা অর্জন না করলে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা বড়ই দুষ্কর। শিক্ষার এ লক্ষ্যটি সম্পর্কেও আওরঙ্গযেব অবহিত ছিলেন।

জ. শিক্ষা মানেই অনুধাবন ক্ষমতা ঃ মুখস্থ বিদ্যা আওড়ানো কোন শিক্ষা নয়। কিন্তু আওরঙ্গযেব বাল্যকালে এ শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। শিক্ষার কাজ হলো কোন বিষয় সম্যকভাবে অনুধাবন করা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর এ মুঘল সম্রাট যে শিক্ষা দর্শন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ তা আরও পরে অনুধাবন করেন। আওরঙ্গযেবের শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা দর্শনের গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও বর্তমান কাঠামো

ক. বাংলাদেশ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় গোটা জাতিসত্তার কাঠামো। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাপূরণ, জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন। আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, সৎ নাগরিক, যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই তৈরি সম্ভব।

শিক্ষা জাতির প্রগতি ও সমৃদ্ধির মূল উৎস। আত্মসচেতন, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উত্তম হাতিয়ার শিক্ষা। জাতীয় জীবনে ঐশ্বর্যমণ্ডিত গৌরবময় ঐতিহ্য রচনায় শিক্ষা সর্বাপেক্ষা কার্যকর এবং বলিষ্ঠ তথা সক্রিয় শক্তি। এই প্রসঙ্গে ড. মঞ্জুরী চৌধুরী তাঁর 'সুশিক্ষক গ্রন্থে' লিখেছেন :

"জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে, ধ্যান ধারণাকে রূপায়িত করতে শিক্ষার মতো গতিশীল প্রক্রিয়া দ্বিতীয় নেই।"

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশের তৈরি এবং পাকিস্তান শাসন আমল থেকে চলে এসেছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি এবং মানসিকতা, শিক্ষানীতি পদ্ধতির অব্যবস্থা, অবহেলিত সমাজ কাঠামো এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে করেছিল বিপন্ন। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এদেশের মানুষ বহু ত্যাগ তিতিক্ষা এবং সংগ্রাম করেছে।

সুনাগরিক যেকোন রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রহরী। তাই সুনাগরিক সৃষ্টি করতে হলে অবশ্যই শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে শিক্ষার যে মূল লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে রিপোর্ট পেশ করেছেন। তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

১. ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণ ও শক্তির সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন।

২. শিক্ষায় প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীদের দেশ ও দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীর মনে ন্যায়নীতি, কর্তব্যবোধ, শৃংখলা, শিষ্টাচার সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা সৃষ্টি করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একাত্ম হবার সচেনতা ও সতত সক্রিয়তার উদ্বোধন।

www.pathagar.com

৩. পারস্পারিক প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও মানবাধিকার সম্পর্কে সুন্দর ও সহজ মনোভাব সৃষ্টি করে একে অন্যের সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

৪. দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা যথাযথ সদ্ব্যবহার করে জনগণকে কল্যাণী জনশক্তিতে পরিণত করা।

৫. কর্মমূখী ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিত্তে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতির উন্নতিমূলক সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধানে বাস্তব ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা।

৬. প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা, মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী তাদের জীবিকা অর্জনের উপযোগী পেশা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা এবং প্রাত্যহিক জীবনে উদ্ভূত নানা তাৎক্ষণিক বা অনিবার্য সমস্যাগুলোর সমাধানে ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগের জন্য তাদের আত্ম প্রত্যয়ী করে তোলা।

এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বাংলাদেশের সামাজিক পর্যভূমিতে শিক্ষার যে কয়টি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। তার মূলকথাগুলো হচ্ছে:

(ক) ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
(গ) মানবিক ও সামাজিক গুণের বিনিয়োগ।
(ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করা।
(ঙ) বাস্তবমুখী জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রিক শিক্ষা।
(চ) জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম।
(ছ) গৃহ ও সমাজের ভূমিকামূলক শিক্ষা।
(জ) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।
(ঝ) গণশিক্ষা প্রকল্প।
(ঞ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

খ. শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও কার্যকর করার দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রশাসন বলা হয়। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুটি প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করছে।

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ।

এটাও মন্ত্রণালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের আওতায় তিন ধরনের সংস্থা রয়েছে।

(ক) অধিদপ্তর, (খ) পেশাগত সংস্থা ও (গ) আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ।

শিক্ষামন্ত্রণালয় ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি অধিদপ্তর বা বিভাগ রয়েছে। যথা–

www.pathagar.com

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
৩. পরিদর্শন ও অডিট অধিদপ্তর এবং
৪. ফ্যাসিলিটিস অধিদপ্তর।

এছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড।
২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
৩. কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।
৪. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।
৫. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
৬. বাংলাদেশ কারিগরি ইনস্টিটিউট পরিষদ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ঃ এই বিভাগের অধীনে দুটি অধিদপ্তর আছে। এগুলি হচ্ছে—

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২. উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

পেশাগত প্রতিষ্ঠান ঃ শিক্ষা প্রশাসনে তিনটি পেশাগত প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলি হচ্ছে—

১. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী।
২. বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো বা ব্যানবেইজ।
৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী।

গ. বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম প্রচলন ঘটে উপনিবেশিক আমলে। পরবর্তীতে উপনিবেশিক আমলের মূলধারা অক্ষুণ্ন রেখে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে মাত্র। বর্তমানের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোট ৩টি ধাপে সমাপ্ত হয়। যথা—

১. প্রাথমিক শিক্ষা (গ্রেড ১–৫ বা ৫ বছর মেয়াদী) ঃ বাংলাদেশের শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত (বয়স আনুমানিক ৫+থেকে ৯+) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এ স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু কলা, সংগীত, ইসলামিয়াত, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম এবং ইংরেজি (তৃতীয় শ্রেণী থেকে) অন্তর্ভুক্ত আছে।

২. মাধ্যমিক শিক্ষা (গ্রেড ৬ থেকে ১২ বা ৭ বছর মেয়াদী) ঃ এই মাধ্যমিক স্তরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

www.pathagar.com

(ক) নিম্ন মাধ্যমিক (গ্রেড ৬- ৮ বা ৩ বছর মেয়াদী) ঃ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী (বয়স আনুমানিক ১০ + থেকে ১৩+) পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ স্তরে বাংলা, ইংরেজি, সমাজ, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, ধর্ম, শরীর চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

(খ) মাধ্যমিক স্তর (গ্রেড ৯ ও ১০ বা ২ বছর মেয়াদী) ঃ শিক্ষার এ স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবম ও দশম শ্রেণীর (বয়স আনুমানিক ১৪ + থেকে ১৫ +) শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণীর পাঠক্রম শেষে দেশের বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত ও আয়োজিত বহিঃ পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করে। মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, গার্হস্থ অর্থনীতির শাখায় পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা এ স্তরে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (গ্রেড ১১ ও ১২ বা ২ বছর মেয়াদী) ঃ এ স্তরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর (বয়স আনুমানিক ১৬+ থেকে ১৭+) শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণী পাঠক্রম শেষে দেশের বিভিন্ন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরিচালিত ও আয়োজিত বহিঃ পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করে। মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, গার্হস্থ অর্থনীতির শাখার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা এস্তরে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

৩. উচ্চ শিক্ষা (গ্রেড ১২ থেকে তদুর্ধ্ব বা ৯ বছর বা তার অধিক মেয়াদী) ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো শিক্ষা গ্রহণের পরই একজন শিক্ষার্থী স্নাতক, স্নাতকোত্তরসহ উচ্চ ডিগ্রী লাভ করতে পারে। এ শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীকে জীবনের লক্ষ্যানুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে অথবা তার মেধা ও প্রবণতা ভিত্তিক শিক্ষা লাভ করতে হয়। এ স্তরে শিক্ষার্থীগণ কৃষি, কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইসলামি আইন সহ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এই স্তরের শিক্ষাগুলো হচ্ছে—

(ক) বি. এ / বি. এস. সি/ বি. কম (পাস) ঃ সাধারণত ২ বছর মেয়াদী শিক্ষার পর ডিগ্রী দেয়া হয়। তবে বর্তমানে এই কোর্স ৩ বছর মেয়াদী করা হয়েছে।

(খ) বি. এ/ বি. এস. সি/ বি. বি. এ (অনার্স বা সম্মান) ঃ এই শিক্ষা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেবার সুযোগ থাকে। তবে বর্তমানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠান থেকেও এই শিক্ষা নেয়ার সুযোগ করা হয়েছে। পূর্বে এটা ছিল ৩ বছর মেয়াদী। ১৯৯৮ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে ৪ বছর মেয়াদী কোর্সে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(গ) এম. এ/ এম. এম. এস/ এম. কম ঃ মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য স্নাতক (পাসের ক্ষেত্রে) পাসের পর ৩ বছর মেয়াদী কোর্স পড়তে হয় এবং স্নাতক (সম্মানের ক্ষেত্রে) পাসের পর ১ বছর মেয়াদী কোর্স পড়তে হয়।

(ঘ) এম. ফিল ঃ এই ডিগ্রীর জন্য কমপক্ষে ২ বছর লাগে। স্নাতকোত্তর শেষে বিভিন্ন বিভাগে স্তরের যোগ্যতার ভিত্তিক এই ডিগ্রী গ্রহণের সুযোগ থাকে।

(ঙ) পি. এইচ. ডি ঃ এই ডিগ্রী বিদেশে গিয়ে পূর্বে নেয়ার হত এবং বর্তমানেও এসব ডিগ্রী গ্রহণের জন্য অধিকাংশই বিদেশে যায়। তবে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সহ দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ডিগ্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ লন্ডন, প্যারিস, জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, অস্টেলিয়া ও ভারতে যায়।

মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষা ঃ সাধারণ শিক্ষার সমান্তরাল ইসলাম ধর্মীয় বা মাদ্রাসা শিক্ষার একটি ধারা বিদ্যমান। এই শিক্ষার ৫টি ধাপ রয়েছে। যথা—

১। ৫ বছর মেয়াদী এবতেদায়ি শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা।
২। ৫ বছর মেয়াদী দাখিল শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষা।
৩। ২ বছর মেয়াদী আলিম শিক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা।
৪। ২ বছর মেয়াদী ফাজিল শিক্ষা বা ডিগ্রী (পাস) শিক্ষা।
৫। ২ বছর মেয়াদী কামিল বা মাস্টার্স ডিগ্রী শিক্ষা।

দাখিল ও আলিম পরীক্ষাসমূহকে সাধারণ শিক্ষার এস.এস. সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষার সমমানের ধরা হয়। ফাজিল ও কামিলকে সাধারণ শিক্ষা ধারার স্নাতক (পাস) ও মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমানের হিসাবে স্বীকৃত দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

কারিগরি ও বৃত্তি মূলক শিক্ষা ঃ এই শিক্ষা তিনটি পর্যায়ে রয়েছে। যথা—

১. গ্রেড ৮ এর পরে ১ থেকে ২ বছরের সার্টিফিকেট পর্যায়।
২. এস. এস. সি পাসের পর ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা পর্যায়।
৩. এইচ. এস. সি. পাসের পর ৪ বছরের স্নাতক পর্যায়।

বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা ঃ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পঙ্গুদের জীবন নির্বাহের উপযোগী ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অন্ধ প্রতিবন্ধীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১% কোটা নির্ধারিত রয়েছে।

ঘ. শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়ণ/ পরীক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কেননা মূল্যায়ণ তথা পরীক্ষার মাধ্যমেই কোন শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি নির্ণয় সম্ভব। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হয় উপনিবেশিক যুগে। এর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আজ ও হয়নি।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা পদ্ধতি একই। তবে কিছু বিদ্যালয় বছরের দুটি পরীক্ষা নিলেও সরকারি স্কুলগুলোতে বছরে তিনটি পরীক্ষা নেয়া হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বছর শুরু থেকে ৪/৫ মাস পর একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যা প্রথম সামরিক পরীক্ষা নামে পরিচিত। এই পরীক্ষা বিভিন্ন স্কুলের সিলেবাস অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ৪ মাস পর যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা নামে পরিচিত। এই পরীক্ষাও স্কুলের সিলেবাস অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

বার্ষিক পরীক্ষা ঃ বছরের শেষে সাধারণত নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষা কোন স্কুলে সম্পূর্ণ সিলেবাস আবার কোন স্কুলে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেয়া হয়। অধিকাংশ স্কুলেই তিন পরীক্ষার গড় নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশ করে। তবে কোন কোন স্কুলে শুধু বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে ছাত্র-ছাত্রীর যোগ্যতা নির্ধারণ করে।

অর্ধবার্ষিকী বা ষান্মাসিক পরীক্ষা ঃ এই পরীক্ষা সাধারণত শহরাঞ্চলে বিশেষ করে, রাজধানীর ঢাকার বেসরকারি স্কুলগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়। বছরে আরো দুটি পরীক্ষা গ্রহণ করে। যথা— (১) অর্ধবার্ষিকী বা ষান্মাসিক ও (২) বার্ষিক পরীক্ষা। অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সাধারণত জুন ও জুলাই মাসে স্কুলের সিলেবাস অনুযায়ী।

প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ঃ পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীগণ সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বর্ষের শেষে সরকার অনুমোদিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরকারি বৃত্তি পায় এবং বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ পায়।

টেস্ট পরীক্ষা ঃ কোন শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক অথবা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পূর্বে স্কুল অথবা কলেজ কর্তৃক টেস্ট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে এস.এস. সি কিংবা এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। এই পরীক্ষা সাধারণত মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর ৩/৪ মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এস. এস. সি পরীক্ষা (মাধ্যমিক) ঃ নবম শ্রেণীর শুরুতেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা বিভাগভুক্ত হতে পারে। তাদের সামনে কয়েকটি বিভাগ উন্মুক্ত থাকে। যেমন বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দনুযায়ী বিভাগ নির্বাচন করতে পারে। নবম শ্রেণীতে স্থিরকৃত বিভাগ নিয়েই দু'বছর মেয়াদী শিক্ষা শেষে তাদেরকে জাতীয় ভিত্তিক বড় ধরনের পরীক্ষায় এস. এস. সি-তে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

এইচ. এস. সি (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা ঃ এস. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুনরায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (এইচ. এস. সি) অবতীর্ণ হতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দুই বছর অন্তর অন্তর ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি বড় ধরনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। তাই তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যারা নিয়মিত অধ্যয়ন করে একমাত্র তারাই এ চাপ সফলভাবে উৎরাতে পারে।

উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি মোটামুটি এক রকম হলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোর্সের পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। কখনো দুই বছর অন্তর (ডিগ্রী পাস) পরীক্ষা দিতে হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স কোর্সের ক্ষেত্রে কোথাও সেমিস্টার কোথাও টার্ম সিস্টেম, কোথাও ইয়ার ফাইনাল কিংবা কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই পরীক্ষা কোথাও ৬ মাস অন্তর অন্তর আবার কোথাও ১ বছর অন্তর অন্তর দিতে হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষা কমিশনের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৮২-২০০৪)

ইতিহাসের আলোকে শিক্ষা কমিশন ঃ আমাদের উপমহাদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাচীন কালে আর্যদের শিক্ষা, ব্রাহ্মণদের শিক্ষা, বৌদ্ধদের শিক্ষা এবং ইসলামি শিক্ষা ব্যাপক ভিত্তিক চালু ছিল।

মোঘল শাসনের অবসানের পর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসন লাভের পরও দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সর্ব প্রথম এদেশে শিক্ষা সংসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারি বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক স্কটল্যান্ডবাসী মিশনারী শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড উইলিয়াম এ্যাডামকে বাংলা ও বিহার বা প্রদেশের দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য শিক্ষা কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি (১৮৩৫- ১৮৩৮) সালের মধ্যে বাংলা বিহার প্রদেশের দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এবং নড়বড়ে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম শিক্ষার একটা কাঠামোগত রূপ দান করে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রথম কাজ শুরু করে ১৭৯২ সালে। সেই সময় চার্লস গ্রান্ড কমিশনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার। এরপর ১৮১৩ সালে কোম্পানি সনদ, ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলে কমিটি, ১৮৩৮ সলে উইলিয়াম অ্যাডামস কমিটি, ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন, ১৯৩৪ সালে সার্জেন্ট কমিটি এ অঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন সময় রিপোর্ট পেশ করে শিক্ষানীতি দাঁড় করিয়েছিল। ব্রিটিশ পরবর্তী যুগে আসে পাকিস্তানীরা। ২৩ বছরের ইতিহাসে তারাও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু নাড়াচড়া করে একটা রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানীদের এই প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৫২ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান কমিটি, ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৫ সালে হামিদুর রহমান কমিশন এবং ১৯৬৯ সাল নূর খাঁ কমিশন গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রিপোর্ট করায় ছাত্রদের আন্দোলনে কোনটাই বাস্তব রূপ লাভ করেনি।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরির জন্য ১৯৭২ সাল থেকে কাজ চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুদরাত-এ খুদা কমিশনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯৭৭, ১৯৮৩, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ২০০১ এবং সর্বশেষ ২০০৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষার উপর ৭ টি কমিশন গঠন করে শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়।

হান্টার শিক্ষা কমিশন ১৮৮২ (প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন)

পটভূমি ঃ ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপন কর্তৃক নিয়োগকৃত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (Indian Education Commission, ১৮৮২ বা I.E.C) হান্টার কমিশন নামে পরিচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেন এবং বলেছিলেন যে, আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সুযোগ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠাগুলোর সহায়তায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি পক্ষের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তবে যেসব জেলায় বেসরকারি প্রচেষ্টায় আদর্শ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, সরকারি উদ্যোগে জনস্বার্থে সেখানে অন্তত একটি করে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কমিশন স্বীকার করেন।

"এ" কোর্স ও "বি" কোর্স ঃ এ যাবৎকাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হিসেবে একমুখী তত্ত্বগত বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। তাই কমিশন উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে দুটো অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেন। যথা 'এ' কোর্স ও 'বি' কোর্স। 'এ' কোর্সে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় ও "বি" কোর্সে থাকবে সাহিত্য বহির্ভূত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম ঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন নীরব ছিলেন। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম করে শিক্ষা পরিচালনার পক্ষপাতি ছিলেন।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (১৮৯৮–১৯০৪)

হান্টার কমিশনের প্রায় ১৫ বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজে হাত দেয়ার পূর্বেই তিনি শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনার জন্য ১৯০১ সালে কাশ্মীরের সিমলায় এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে লর্ড কার্জন সমস্ত প্রদেশের শিক্ষা ডিরেক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের আহ্বান জানান। এই আলোচকগণ দীর্ঘ ১৫ দিন আলোচনার পর শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ১৫০ টি প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এ সমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২। **মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ঃ** গ্রান্ট ইন এইড প্রথার প্রবর্তনের পর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টা অবাধ গতিতে বিস্তার লাভ

www.pathagar.com

করেছিল। তার ফলে বহু ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের বিশেষ অবনতি ঘটে। এমন অনেক স্কুল ছিল যেগুলোতে অত্যন্ত নিম্নমানের শিক্ষাদান করা হতো। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কার্যকারিতার দিক থেকে তাদের বিশেষ মূল্য ছিল না। শিক্ষার এ অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার রোধ করতে লর্ড কার্জন উপযোগী সিদ্ধান্ত নেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অনুসৃত নীতি হলো ঃ (১) শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ ও (২) শিক্ষার মানের উন্নয়ন।

স্কুল অনুমোদন ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কার্জন স্কুলগুলোতে অনুমোদন প্রথার প্রবর্তন করেন। স্কুলগুলোর ওপর দু প্রকারের অনুমোদন প্রথা বলবৎ হয়। প্রথম-শিক্ষা বিভাগের, দ্বিতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের। এতে মাধ্যমিক শিক্ষার বাধাহীন প্রসার খর্ব হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কুল পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্যও আরও অসুবিধা হতো। যুগ্ম অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনে সে অসুবিধা দূর হলো। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত স্কুলগুলো নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হয় ঃ

ক. সরকারি গ্রান্ট-ইন-এইড লাভ;

খ. সরকারি পরীক্ষাগুলোতে ছাত্র প্রেরণ ;

গ. সরকারি ছাত্র-বৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে পরবর্তীকালে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাণহীনতা ও যান্ত্রিকতার ছাপ দেখা দিয়েছিল। অনুমোদন শর্ত যতাযথ পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক স্বেচ্ছা সৃষ্ট বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন ব্যবস্থা ঃ কার্জন প্রচলিত স্কুলগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যও সচেষ্ট হন। তাঁর এ নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করেন।

ক. সরকারি উচ্চ স্কুলগুলোকে আদর্শ মডেল স্কুলরূপে পরিচালনা করতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকারি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. বেসরকারি বিদ্যালয় যাতে সরকারি মডেল স্কুলের উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে, তার জন্য বিপুল পরিমাণ গ্রান্ট-ইন-এইড বিতরণের আয়োজন করা হবে। লর্ড কার্জন স্কুলের পরীক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি এবং এ নীতির ফলে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দেয়ার নীতি ক্রমশই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লুপ্ত হয়।

গ. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দিকে কার্জন অধিকতর মনোযোগ দিলেন। ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে তিনি নির্দেশ দেন যে, শিক্ষণ কলেজগুলোকে উন্নত করে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

স্কুলভবন নির্মাণ, ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

১. পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা।
২. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে জোরদার করা।

স্যাডলার কমিশন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন)

পটভূমি ঃ ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ, এর গঠনমূলক নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনকে স্যাডলার কমিশন বলা হয়। সভাপতি ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নামানুসারে এ কমিশন "স্যাডলার কমিশন" নামে পরিচিত। এ কমিশনের ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ (পরে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন ডঃ গ্রেগরি, স্যার ফিলিপ হার্টগ, প্রফেসর রামজে মুইর। ১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ কমিশনের রিপোর্ট আন্তঃপ্রাদেশিক গুরুত্ব বহন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করার লক্ষ্যে এ কমিশন গঠিত হলেও এর উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উপর উচ্চ শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে বিধায় মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার না করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। উচ্চ স্তরের শিক্ষা সংস্কারের জন্য প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও এ কমিশন প্রতিবেদন পেশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য স্যাডলার কমিশন গঠিত হলেও সঠিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে এ কমিশনের পেশকৃত প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ স্যাডলার কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ওপর উচ্চ শিক্ষার সংস্কার নির্ভর করে। এ জন্য কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ পেশ করেন।

১. ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার পরিবর্তে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাই মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে ভিভাজক রেখা নির্ণয় করবে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করা যাবে।

২. ডিগ্রী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস আলাদা করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এ কলেজসমূহ আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অথবা নির্ধারিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে পরিচালিত হতে পারে। এ ধরনের নতুন কলেজে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষক শিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রদেশে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠিত হবে এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। মিশন আশা করেন যে, প্রস্তাবিত বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ভার লাঘব হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

সার্জেন্ট পরিকল্পনা – ১৯৪৪

পটভূমি ঃ উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যায়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা (Central Advisory Board of Education) ১৯৪৩ সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা উপদেষ্টা জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করেন ১৯৪৪ সালে। এই রিপোর্টটিকে বলা হয় যুদ্ধ পরবর্তী এ উপমহাদেশের শিক্ষক উন্নয়ন রিপোর্ট। এই কমিটি নতুন কোন শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেননি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা ইতোপূর্বে যেসব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে মূলত সার্জেন্ট রিপোর্ট হলো সেগুলোরই পূর্ণাঙ্গ রূপ। কমিটির লক্ষ্য ছিল অন্তত ৪০ বছরের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িকভাবে ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের পর্যায়ভুক্ত করা।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে সার্জেন্ট কমিটি প্রদত্ত সুপারিশগুলো হল–

১. ছাত্রদের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সাধারণ বয়স এগার বছর হওয়ার চাই এবং এ স্তরে ছয় বছর ব্যাপী অধ্যয়ন করতে হবে। বিবরণীতে ছাত্রদের নির্বাচন করার জন্য কতকগুলো সাধারণ নিয়মও উল্লিখিত হয়।

২. মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) হিসেবে প্রবর্তন করা হবে। একাডেমিক বিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা দেবে আর টেকনিক্যাল বিদ্যালয় প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করবে।

৩. উভয় ধরনের বিদ্যালয়ের জন্য সার্জেন্ট বিবরণীতে পাঠ্যসূচিও নির্ধারিত হয়।

৪. উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কমিশন মন্তব্য করেন যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ শিক্ষার পর যাতে অধিকাংশ ছাত্ররা সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৮)

পটভূমি ঃ ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের সুপারিশ করে। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের জন্য গঠিত দুটি কমিটির রিপোর্টে শিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়ন হয় নি। এমনিভাবে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলতে থাকে। পরবর্তীতে শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারে দাবি ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করে। কাজেই একটা সুসংবাদ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এস, এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যানের নামানুসারে ইহা 'শরীফ কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৫৯ সালে ৫ জানুয়ারি এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কমিশনকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে জাতীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী করে সংগঠনের সুপারিশ করতে বলেন। কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়ন চরিত্র গঠন, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সুপারিশ করার জন্য তিনি কমিশনকে অনুরোধ করেন।

কমিশন শীঘ্রই শিক্ষার স্তর, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে পাকিস্তানের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সাময়িক বেসাময়িক কর্মচারী ও সর্বস্তরের জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে কমিশন সুচিন্তিত অভিমতসহ সুপারিশ প্রণয়নের কাজ শেষ করে ১৯৬০ সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ কমিশনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলা। শিক্ষা সমাজ ও ব্যক্তিকে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে নেয়ার সহায়ক হবে, গড়ে তুলবে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সংহতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামি মূল্যবোধ সংগঠিত হবে শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস ও পুঁজি সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নীত হবে কারিগরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। একটি প্রগতিশীল ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার হল ঃ

১. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এ স্তরের শিক্ষা এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সমাপ্তির পরে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শী হতে পারে।

২. এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে একজন নাগরিক, কর্মী এবং দেশপ্রেমিক হিসাবে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে।

৩. নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হবে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক না করা পর্যন্ত ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে থাকবে। মাধ্যমিক স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে।

ক. অন্তর্বর্তী শিক্ষা–৬ষ্ঠ হতে ৮ম মান

খ. মাধ্যমিক নবম ও দশম শ্রেণী এবং

গ. উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী মিলিয়ে।

এ শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হয় সাধারণ শিক্ষার সাথে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পূর্বে আরোপিত শর্ত না মানার ফলে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়েছে যাতে শিক্ষক, ঘর দরজা ও এবং সাজসরঞ্জাম নেই। শিক্ষার মানেরও অবনতি ঘটেছে। কাজেই মঞ্জুরী দানের শর্ত সঠিকভাবে পালনের উপর গরুত্ব দিতে হবে।

www.pathagar.com

অর্থসংস্থানের জন্য কমিশনের সুপারিশ মতে ৬০% ছাত্র বেতন ২০% বিদ্যালয় পরিচালকদের দান এবং ২০% সরকারি সাহায্য দিবে। সরকারি সাহায্য এবং মঞ্জুরী দানের বেলায় শর্ত পালন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে।

আকরাম খান কমিটি (১৯৫১)

একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালে একটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিকে বলা হয় পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি। এ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আকরাম খান। তাই এ কমিটিকে আকরাম খান কমিটি বলা হয়। কমিটি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর সুপারিশ পেশ করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে ২টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। এর একটি হচ্ছে পাকিস্তান এবং অন্যটি ভারত। স্বাধীন দেশের জন্য একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ ভাবাপন্ন অনুগত্য একদল কর্মচারী তৈরি করা,

২. জাতীয় ভাষারূপে কোন ভারতীয় ভাষা তখনও স্বীকৃতি পায়নি,

৩. ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে সরকার কোন দিনও সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিল না,

৪. ধর্মের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল নিরপেক্ষ,

৫. গণশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ঔদাসীন্য ছিল সুস্পষ্ট। তখন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় করা হত এবং প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল।

৬. ব্রিটিশ সরকার এ দেশকে কাঁচামাল যোগান ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত করে।

সংক্ষেপে দু শ বছরের ব্রিটিশ শাসন আমলে এদেশের শিক্ষা ছিল পুঁতি সর্বস্ব ও পরীক্ষা কেন্দ্রিক। তখন এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছিলেন। তাই জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে জীবন ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। উল্লিখিত অবস্থা দূরীকরণের জন্য স্বাধীন দেশে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা :

১. ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও ৬ বছরের হতে হবে এবং ভর্তির জন্য স্বাভাবিক বয়স প্রায় ১১ বছর হতে হবে।

২. উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ২ ভাগে বিভক্ত হতে হবে। যেমন– ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক ধাপ এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক ধাপ।

৩. বর্তমানে প্রচলিত মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ধাপটি বিলুপ্ত করতে হবে এবং এর একটি শ্রেণীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করে এবং অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রীর কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

৪. উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যশাখায় ভর্তি ছাত্রদের মেধা ও দক্ষতা নির্ণয়ের ভিত্তিতে হতে হবে।

৫. ছাত্রদেরকে নিম্ন মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

৬. মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে।

৭. যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অথবা উচ্চ কারিগরি অথবা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদার্পণ করবে তাদেরকে ইংরেজি ভাষা ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়তে হবে।

৮. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাষ্ট্র ভাষার একটা সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত উর্দু অথবা আরবি শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

৯. ধর্মকে মুসলমান ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় করতে হবে। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় এবং নৈতিকশাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা তাদের স্বীয় ধর্মে অধ্যয়ন করতে না চায়।

১০. শারীরক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য করতে হবে।

১২. প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাসূচি পর্যন্ত (অষ্টম শ্রেণী) সংযুক্ত করতে হবে।

১৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন–

ক. পৃথক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

খ. পৃথক উচ্চ বিদ্যালয়।

গ. সংযুক্ত নিম্ন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রয়োজন সেখানে রাখা যেতে পারে।

১৪. সরকারকে উপযুক্ত স্থানে কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৫. সরকারকে প্রত্যেক মহকুমায় আধুনিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অন্তত পক্ষে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এ বিদ্যালয়সমূহে স্থানীয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে যতগুলো বিভাগ বা বিষয় ন্যায্য মনে হয় তার প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের সরাসরি অনুদান কোন স্থানের অবস্থার ওপর নির্ভর করে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক এবং ছাত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আবাসিক ব্যবস্থাও করতে হবে।

১৬. অন্যান্য স্থানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত স্বেচ্ছাশ্রম একটি পরিকল্পনার ভিত্তিতে সরকারের সুবিবেচনার মধ্যে থাকবে। শিক্ষার্থীর চৌদ্দ বছর বয়স

www.pathagar.com

পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রদেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে এ বিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়।

১৭. নিম্ন বর্ণিত ফল লাভের লক্ষ্যে বর্তমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একটি জরিপকার্য পরিচালনা করতে হবে।

ক. অযোগ্য এবং নিস্প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়সমূহকে অপসারিত পুনর্বণ্টিত বা সংযুক্ত করা।

খ. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১৮. মহকুমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় ভারের অন্ততপক্ষে ৫০% সরকারের বহন করা উচিত।

১৯. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৮,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২০. বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন স্কেল যতদূর সম্ভব সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমসাময়িক হতে হবে এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২১. প্রত্যেক মহকুমার প্রধান কার্যালয়ে একজন মহকুমা শিক্ষা অফিসার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন।

২২. প্রদেশের প্রধান কার্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একজন সহপরিচালক থাকতে হবে।

২৩. বর্তমান বিদ্যালয়ের মহিলা পরিদর্শকের পদটি পরিবর্তিত করে নারী শিক্ষার সহকারী পরিচালিকার পদে রূপান্তরিত করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক জেলায় মহিলা শিক্ষা অফিসার থাকতে হবে।

২৪. গণশিক্ষা পরিচালকের উপাধি পরিবর্তন করে শিক্ষা পরিচালকে রূপান্তরিত করতে হবে।

২৫. প্রদেশের ছয়টি রেঞ্জ পরিদর্শকের (Range Inspector) পদ অবলুপ্ত করে ১৫ জন জেলা পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ পদগুলো জেলা শিক্ষা অফিসার পদে রূপান্তরিত করতে হবে। জিলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকবেন।

২৬. শিক্ষা পরিদপ্তরে কিছুসংখ্যক বিশেষ পদ সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্য বিষয়ে পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিদর্শকের জন্য নতুন পদসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দও নিয়োজিত থাকবেন।

আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৭

পটভূমি ঃ ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আকরাম খান শিক্ষা কমিশন ১৯৫২ এর সংস্কার প্রস্তাবসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার

www.pathagar.com

কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এ রিপোর্টটি ১৯৫৭ সালের আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা :

মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ১১ বছরের অর্থাৎ পাঁচ বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার পর ছয় বছর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার কোর্স চালু করতে হবে।

২. মাধ্যমিক কোর্সের প্রথম তিন বছর নিয়ে জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরবর্তী তিন বছর নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল অথবা পূর্ণ ছয়টি শ্রেণী নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল স্থাপন করতে হবে।

৩. সিনিয়র ও জুনিয়র হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও চালু করা যেতে পারে।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হবে। প্রতি ৫০ হাজারে জনসংখ্যা অনুপাতে একটি সিনিয়র হাইস্কুল এবং প্রতি পঁচিশ হাজার লোকের বসতি–পূর্ণ এলাকায় একটি জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. সরকারের অনুদান ব্যতিরেকে কোন স্কুল পরিচালিত হতে পারবে না।

৬. সমগ্র দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের বেতনের হার সমহারে থাকবে।

৭. শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র হাইস্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

৮. সিনিয়র হাইস্কুলে বাছাইয়ের মাধ্যমে এমন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে যারা শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ লাভে সমর্থ হবে।

৯. মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন রূপে ব্যবহৃত হবে এবং মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১০. জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রমে ভাষা, সমাজ পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, ধর্ম শিক্ষা অথবা নীতি শিক্ষা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, হস্তশিল্প, শরীর চর্চা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি থাকবে। এগুলোর মধ্যে ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ও একটি হস্তশিল্প আবশ্যিক বিষয়রূপে গৃহীত হবে।

১১. সিনিয়র হাইস্কুলে বহুমুখী পাঠ্যক্রম থাকবে। যেমন– মানবতামূলক তত্ত্বশিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলামিকশাস্ত্র (Islamic Studies) প্রভৃতি।

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭২

পটভূমি ঃ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রক্তঝরা দিনগুলোর সীমাহীন ত্যাগ ও কঠোর সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনজীবনে অর্থবহ করতে হলে ইংরেজ প্রবর্তিত ও পাকিস্তান আমলে

www.pathagar.com

প্রচলিত শিক্ষা যে যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয় তা বলাই বাহুল্য। তাই সর্বমহল থেকে শিক্ষা সংস্কারের দাবি উঠেছে। বাংলাদেশের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে হলে জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে, যাতে জনগণ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার জনসম্পদে পরিণত হতে পারে। এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসেছিল। এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এ দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন জাতি নিকট মৌলিক দায়িত্ব।

২৬ জুলাই, ১৯৭২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ অভাব ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশনা এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথনির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এ কমিশন নিয়োগ করেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরামর্শ দানের জন্য কমিশনের সদস্যদের আহবান জানান। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশন কুদরত-ই-খুদা কমিশন নামে পরিচিত। বিভিন্ন পেশার লোকদের নিকট থেকে কমিশন প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবান অভিমত সংগ্রহ করেন। কমিশন অভিমতগুলো ব্যাপক পর্যালোচার পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সুচিন্তিত সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং ৩০ মে, ১৯৭৪ তা রিপোর্ট আকারে সরকারের নিকট পেশ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ব্যাপ্তি, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, কাঠামো, শিক্ষাক্রম, মাধ্যমিক পর্যায়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষ বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর মতামত প্রদান ও নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কী বা মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ব্যাপ্তি ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষা-কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও প্রথম ডিগ্রী শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। আর এই শিক্ষার উৎস বা উৎপত্তি হচ্ছে অতীতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বা অতীতের সরকার, মিশনারী ও ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগ।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য/বৈশিষ্ট্য ঃ ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে গঠিত বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বকে পরিমাণে এবং পরিসরে বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সুসংহত করতে হবে।

www.pathagar.com

২. সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। উক্ত উদ্দেশ্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমাজের একজন সদস্য এবং সমাজের অন্য সবার সাথে মিলে মিশে তাকে বসবাস করতে হবে। এর জন্য দরকার কর্তব্য প্রতিপালন এবং কুসংস্কারমুক্ত মনমানসিকতা।

৩. দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা। কারণ অতীতের পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে জনসম্পদে পরিণত না করে জনদায়ে পর্যবসিত করেছে। তাই দেশের সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে।

৪. মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা। উন্নয়নশীল দেশে সবার জন্য উচ্চ শিক্ষা বিলাসিতা। তাই কমিশন শুধু মেধাসম্পন্নদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুপারিশ করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কমিশনের সুপারিশ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠন– মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সংগঠনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর ধরে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যায়। অর্থাৎ যে সব শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক কোর্স গ্রহণ করবে তাদের জন্য মাধ্যমিক স্তর হবে একাদশ পর্যন্ত এবং যারা সাধারণ কোর্স নেবে তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

২. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণকরণ–এতদউদ্দেশ্যে একই শিক্ষায়তনে তিন/চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় থাকবে এবং শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত হবে। তাছাড়া একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি মনোবিজ্ঞান সম্মত। কারণ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পরিবেশ বিচ্ছিন্ন।

৩. উক্ত অবস্থার অবসানকল্পে কমিশন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার সুপারিশ করেছে। এতে করে নতুন মাধ্যমিক খোলার ব্যয়ভার অনেকাংশে লাঘব হবে।

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি জীবন-ঘনিষ্ঠ করণ ঃ কমিশনের মতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের মত ছাত্রছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে ফলে জনদায় হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে। তাই কমিশন স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মধারা ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচি পরিমার্জনের সুপারিশ করেছে।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর প্রান্তিক শিক্ষা স্তর ঃ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে বিবেচিত হবে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন ও স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে।

৬. কমিশন নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা কার্যক্রমকে দু ভাগে ভাগ করেছে। যথা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণীতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যক পঠনীয়

www.pathagar.com

হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৮. দশম শ্রেণী শেষে উভয় ধারার শিক্ষার্থীরা বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে।

৯. দশম শ্রেণীর পর সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নির্ধারিত বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমসমূহের যে কোন একটিতে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। অপরপক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর বৃত্তি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজন মত একাদশ শ্রেণীতে এক বছর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং বহিঃ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে এবং সার্টিফিকেট পাবে।

১০. বৃত্তিমূলক শিক্ষাস্তরও হবে প্রান্তিক শিক্ষাস্তর। অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রান্তিক শিক্ষা লাভের পর মধ্যস্তরের জনশক্তিতে পরিণত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষার্থীদের বিশ ভাগকে এবং পরবর্তী পরিকল্পনায় অন্তত পঞ্চাশ ভাগকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নিয়ে আসতে হবে।

১১. কমিশন আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সুপারিশ করে। কমিশন আঞ্চলিক সমবায় সংস্থা গঠনেরও সুপারিশ করেছে।

১২. কমিশনের মতে দেশের ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে নবম-দশম ও একাদশ শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তিত করতে হবে।

১৩. কমিশন মাধ্যমিক স্তরের জন্য নিম্নোক্ত শিক্ষাক্রম সুপারিশ করেছে ঃ

শ্রেণী : নবম ও দশম

কলা বিভাগ		বিজ্ঞান বিভাগ		বৃত্তিমূলক	
বাংলা	২০০	বাংলা	২০০	বাংলা	২০০
ইংরেজি	১০০	ইংরেজি	১০০	ইংরেজি	১০০
গণিত	১০০	গণিত	১০০	গণিত	১০০
সাঃ বিজ্ঞান	১০০	পদার্থবিদ্যা	১০০	সাঃ বিজ্ঞান	১০০
ইতিহাস	১০০	রসায়ন	১০০	বৃত্তিমূলক	৫০০
ভূগোল	১০০	ঐচ্ছিক ৩টি	৩০০		
নৈবাচনিক বিষয় ২টি	২০০	বৃত্তিমূলক ১টি	১০০		
বৃত্তিমূলক বিষয় ১টি	১০০				
মোট	১০০০	মোট	১০০০	মোট	১০০০

১৪. ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের কিছুসংখ্যক শিক্ষায়তনে একাদশ শ্রেণী খোলার এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সুপারিশ করেছে।

www.pathagar.com

১৫. শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার পাঁচ বছর পর শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার অভিমত প্রকাশ করেছে।

১৬. কমিশনের মতে আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নীত হলে দশ বছরের স্কুল শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৭

১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন বিভিন্ন সেমিনার, বৈঠক ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের পরামর্শ গ্রহণ করে। তদুপরি ইউনেস্কোর সৌজন্যে কমিশনের দুই সদস্যের দু'টি কমিটি থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপিনস এবং জাপান ভ্রমণ করে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের দিকনির্দেশনা সম্বলিত সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের বিভিন্ন দিক ও সুপারিশসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হয়। ইহা শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ। সাধারণত ১১ থেকে ১৭/১৮ বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীরা এ স্তরে শিক্ষা লাভ করে। এ সময় কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বর্ধন ও বিকাশ ঘটে। কাজেই এ সময়ের শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সুসংহত করা। বিভিন্ন পঠিতব্য বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান দান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কর্তব্য নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা অর্জন। সুনাগরিকের কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং মেধা ও সম্ভাবনার স্ফুরণ। মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী করা এবং যুক্তি ও চিন্তায় বিশ্বাসী করে পরমসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, সমাজ ও বিশ্বে উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ এবং উত্তম পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলা। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে সক্ষম করা।

প্রেক্ষাপট/বর্তমান অবস্থা ঃ

আমাদের শিক্ষা কাঠামো হল নিম্ন মাধ্যমিক তিন বছর, মাধ্যমিক দুই বছর ও উচ্চ মাধ্যমিক দুই বছর (৩+২+২ = ৭)। এ পর্যায়ে প্রায় দশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

এ দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। শিক্ষকদের বেতনের ৭০%, ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া এবং ১০০ টাকা চিকিৎসা বাতা সরকার বহন করে। তবে বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য সরকার প্রদত্ত অনুদান পর্যাপ্ত নয়।

সমস্যা ঃ শিক্ষকের পদের শূন্যতা, শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা এবং বিদ্যালয় কক্ষের অনুপযুক্ততা। আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ, পুস্তক, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকের অভাব। বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা, পরিচালনার ক্ষেত্রে বস্তুগত ও

www.pathagar.com

আর্থিক সুযোগ সুবিধার অভাব। ম্যানেজিং কমিটির নির্লিপ্ততা, শিক্ষক অভিভাবকের নিয়মিত সংযোগ এবং উন্নয়ন কাজে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সাথে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অভাব।

সমাধান ঃ এসব সমস্যার মধ্যেই সমাধানের সূত্র নিহিত আছে। শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ, গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং নিয়মিত পরিদর্শন ও ম্যানেজিং কমিটির ঘন ঘন মিটিং এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক জোরদার করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে উন্নয়নমূলক তদারকির দায়িত্ব প্রদান এবং স্থানীয় উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তা লাভের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্রমান্বয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন ভাতার পুরোটা সরকার কর্তৃক বহন, অনুদান বৃদ্ধি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

স্নাতক পর্যায়ে অনেক বিষয় প্রবর্তনের ফলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণিত ও পদার্থের পরিবর্তে সহজ বিষয় নিয়ে পাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কমিশনের সুপারিশ :

১. স্নাতক কোর্সে কমপক্ষে দুটি স্কুল বিষয় নিয়ে পাস করা ব্যক্তিকে বি. এড. কোর্সে অগ্রাধিকার দান।

২. তিন বছরের বি.এড. কোর্স চালু করে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানে আগ্রহীদেরকে দুটি স্কুল বিষয়ে দক্ষ করে তোলা।

উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য ইংল্যান্ডে পাবলিক স্কুল, চীনে কী স্কুল, ভারতে নভোদর বিদ্যালয় আছে। আমাদের দেশে মেধাবীদের মেধার অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ ও নিম্নমেধার শিক্ষার্থী তাদের উপযোগী উৎপাদনমুখী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সকলের মূল্যায়ন হয় একই প্রান্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। অগ্রসর পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেই। কাজেই উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীদের লালন ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বাড়তি সময়ে নিরাময়মূলক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কমিশনের সুপারিশ।

১. ১০টি ক্যাডেট কলেজ, ১টি আবাসিক কলেজ এবং কোন কোন ল্যাবরেটরী স্কুলকে বিশেষ ধরনের মেধার স্কুলে রূপান্তর করে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন রাখা উচিত। এতে মেধাভিত্তিক ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষার খরচ বহন করবে সরকার। এ স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষার অনুরূপ হবে।

২. পুরাতন জেলা শহরে কিছু নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

৩. নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীর বাড়তি শিক্ষার সুযোগ নিজ নিজ বিদ্যালয়েই সৃষ্টি করতে হবে। যে সকল শিক্ষক নিরাময়মূলক পাঠদান করবে তাদের মাসিক বেতনের অতিরিক্ত সম্মানী থাকবে। কোন প্রাইভেট টিউশনি থাকবে না।

৪. এস. এস. সি, এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে।

www.pathagar.com

পুনর্বাসন ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ ঃ

১. উপদেশ ও নির্দেশনার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদানকারী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় বহিঃপরীক্ষার সাথে আন্তঃপরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ব্যপ্তি এবং তীক্ষ্ণতা যাচাই ও সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় অসদুপায় বন্ধের জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অনুপাত বৃদ্ধি করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনামূলক ৫০% ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের হার ৫০% হবে। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে রচনাধর্মী ৪০% এবং নৈর্ব্যক্তিক ৬০% হওয়া উচিত। বিশেষ কমিটির পরিচালনায় প্রশ্ন তৈরি ও অভীক্ষা দ্বারা আদর্শায়িত করে শিক্ষা বোর্ড ও টেক্স্ট বুক বোর্ডের আওতাধীন বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। সমতা রক্ষার জন্য প্রতি বিষয়ে কয়েক সেট প্রশ্ন থাকবে। বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নের সাহায্যে আন্ত এবং প্রান্তিক পরীক্ষা নেয়া হবে। পরিদর্শকগণ এসব পরীক্ষায় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে কিনা তা তদারক করবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা উত্তর পত্র মূল্যায়ন করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত ফলাফল উন্নয়ন পরীক্ষা এবং শ্রেণী বিভাগ চালু থাকবে। তবে ভবিষ্যতে গ্রেড পদ্ধতি চালু করার চিন্তা ভাবনা করা উচিত। বেশি পক্ষে দু'টি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পুনঃপরীক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু পরপর তিন বছরের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। একটি 'পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা' স্থাপন করে পরীক্ষার পদ্ধতি সংস্কার করতে হবে। এই সংস্থা বিজ্ঞান সম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রশ্ন ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বহন, বহিঃরক্ষা, আন্তঃরক্ষা, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয় সাধন, উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সংস্কারের পরামর্শ দিবে। এই গবেষণা পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতা বিকাশের বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় আদর্শ অভিজ্ঞতা প্রস্তুত ও নতুন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করবে।

পরীক্ষা কেন্দ্র ঃ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিবেচনা করে পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারিত হবে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র প্রতি থানায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র প্রতি জেলা সদরে হওয়া উচিত। তবে থানা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নীতিগতভাবে পরীক্ষার্থী নিজেদের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে পারবে না এবং পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রচারণা প্রয়োজন। কার্যকর তদারকি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা পরীক্ষার কেন্দ্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। পরীক্ষায় দুর্নীতি সম্পর্কীয় আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২. অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদার করার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে দু'জন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করে একজনকে পাঠক্রমিক এবং অন্যজনকে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের দায়িত্ব দিতে হবে। কলেজেও দু'জন উপাধ্যক্ষ থাকবে। তাঁদেরকে একই রকম দায়িত্ব দিতে হবে।

www.pathagar.com

৩. পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রশস্ত আয়তনের শ্রেণীকক্ষ, প্রশাসনিক কক্ষ, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ, স্টাফ ও শিক্ষার্থী কমন রুম, কৃষি জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি থাকতে হবে।

৪. বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, শিল্প এলাকা, জাদুঘর ইত্যাদিতে শিক্ষা সফর, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার জন্য টীম ও হবি ক্লাব গঠন, প্রতিদিন খেলাধুলার ব্যবস্থা, সুস্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা, বিদ্যালয় সমবায় সেন্টার গঠন, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যোগদান, শ্রেণীকক্ষে শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহার, প্রতিবছর পহেলা মার্চ শিক্ষক দিবস পালন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং সুসম্পর্ক গড়ে তুলে আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষাকে অর্থবহ করতে হবে।

প্রাইভেট টিউশন ঃ প্রাইভেট টিউশনির মত নীতিগর্হিত কাজ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শ্রেণীতে পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ক্লাস ও টিউটরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করে সম্মানী প্রদান, প্রাইভেট টিউশনের বিরূপ ক্রিয়া সম্পর্কে অভিভাবকগণকে সচেতন করা, বাৎসরিক কর্মসূচি অনুযায়ী পাঠদান, পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার, ঘন ঘন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শ্রেণীকক্ষে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান, বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, অন্যান্য দেশের ন্যায় শিক্ষকদের নিবন্ধিকরণ প্রথা চালু ও শিক্ষক সমিতি কর্তৃক এসব বাস্তবায়নের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ শিক্ষানীতি, ১৯৯৭ (প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম শামসুল হক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। উক্ত কমিটি ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট পেশ করে। উক্ত রিপোর্ট ২৫টি অধ্যায়ে লিখিত এবং শিক্ষার প্রত্যেক দিকের উপর কমিটি সুপারিশ পেশ করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে না হয় বৃত্তি মূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পথে যাবে। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। কর্ম জগতের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাধারা। সব ধারাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে এবং কয়েকটি সাধারণ আবিশ্যক বিষয় থাকেবে, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর এক ধারা থেকে অন্য ধারায় গমনের পথ খোলা থাকবে।

সুপারিশ ঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে চার বছরের, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারা নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অবিহিত করা হবে।

www.pathagar.com

২. মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।

৩. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শূন্য পদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৫. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮. দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।

৯. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য অনুপাত হবে ১ঃ৪০।

১০. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।

১১. সরকারের নির্ধারিত হারের চেয়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে মিশনারী ট্রাস্ট এর দেশে বিদেশি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্ধ দেয়া চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলক অনুসরণ করতে হবে। সরকারের অনুমতি ক্রমে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ও' লেবেল থেকে এ লেবেল চালু রাখতে পারবে।

১২. বিভিন্ন জড়িপে দেখা গেছে যে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য অনুদান ভোগ করছে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্ধ থেকে।

www.pathagar.com

মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন
জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সভ্যতার অগ্রগতির মূল বাহন হচ্ছে শিক্ষা, স্বাধীনতা উত্তর বিগত ৩৩ বছরেও আমাদের দেশে শিক্ষার সার্বজনীন রূপরেখা পায়নি, প্রতিনিয়ত চলছে পরিবর্তনের ধারা। আর এই পরিবর্তনের জন্য গঠন করা হচ্ছে শিক্ষা কমিশন। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ইতোপূর্বেও ৬টি কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু কোনটাই প্রকৃত পক্ষে আলোর মুখ দেখেনি। সর্বশেষ ২০০৩ সালে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে নতুন কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষার নানা খুঁটি নাটি দিক বিবেচনা করে এই কমিশন ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে রিপোর্ট পেশ করে :

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা– (১) নিম্নমাধ্যমিক, (২) মাধ্যমিক, (৩) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়। নীচে এ পর্যায়ের জন্য গৃহীত সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো—

সরকারি স্কুল স্থাপন ঃ সরকারকে স্কুল ম্যাপিং এর মাধ্যমে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি বছরে কমপক্ষে ২৫ টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছে কমিশন।

মডেল স্কুল ঃ কম খরছে ভাল লেখাপড়া ও উন্নত সুযোগ সুবিধার জন্য প্রতিটি উপজেলায় আগামী ১০ বছরের ভিতর একটা করে মডেল স্কুল স্থাপন।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ঃ শহর অঞ্চলে পাসের হার কোন রকমে ঠিক থাকলেও মফস্বল অঞ্চলে কোন পাবলিক পরীক্ষা এলে দেখা যায় রেজাল্ট বিপর্যয়। এর মূল কারণ ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞানের জন্য ভাল ও পর্যাপ্ত শিক্ষক না পাওয়া। এই কমিশনে পর্যাপ্ত ভাল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

কোচিং, নোট, প্রাইভেট নিষিদ্ধ ঃ শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার সুষ্ঠু মান বজায় রাখার জন্য কোচিং সেন্টার, নোট, গাইড প্রকাশনা ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কোন ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে বেশি দুর্বল হলে তার মান উন্নয়নে উক্ত বিষয়ের শিক্ষক ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ ৬ ঘণ্টা ছাত্রদের পড়াতে পারবেন।

শিক্ষার মাধ্যম ঃ আমাদের বাঙালি চেতনাকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে তবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

স্কুলভিত্তিক নম্বর প্রদান ঃ স্কুরের শিক্ষকই একজন শিক্ষার্থীকে ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে। তাই একজন ছাত্র কেমন তা একজন শিক্ষকই ভাল মূল্যায়ন করতে পারবেন। এজন্য বর্তমান কমিশনে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ এখন থেকে স্কুল পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য না করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কোন শিক্ষার্থী যদি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কম জ্ঞান অর্জন

www.pathagar.com

করে তবে নির্দিষ্ট শিক্ষকের আওতায় এনে তার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি ঃ দলাদলির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুরবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হয়। এটা বন্ধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

একমুখী শিক্ষা ঃ এতদিন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে নবম শ্রেণী থেকে বিভাজনের মাধ্যম মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখার সৃষ্টি হত। এতে অনেক শিক্ষার্থীর কোনো বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হত না। এটা বন্ধের জন্য কমিশন একমুখী অর্থাৎ বিজ্ঞান, মাণবিক, বাণিজ্য সব এক করে সকলকে এসএসসি পর্যন্ত একই রকম শিক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

পাঠ্য বিষয় ঃ একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আনয়নের ফলে পাঠ্যক্রমে আনতে হবে ব্যাপক রদবদল। কমিশন এজন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এক রকম পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছে। আর নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য আর এক রকম পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছে। এতে বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি করে তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছে কমিশন। তবে কলেজের পড়াশোনা ব্যাপক ও বিস্তৃত বলে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়নি।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

ভূমিকা ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা। এই শিক্ষাস্তরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আরও অনেক অসুবিধাজনিত কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না। আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য তথা দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এই সমস্যাগুলো দূর করা একান্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরে বিরাজমান সমস্যাগুলোর একটি বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

১। স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ঃ আমাদের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুল বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত। অধিকাংশ স্কুলের সামাজিক পরিবেশ দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। এর উপর সবার সমান অধিকার। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল নয়। স্কুলের খেলার মাঠ জনসাধারণের খেলার মাঠ এবং গোচারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্কুলের আসবাবপত্র তারা প্রয়োজনে বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করে স্কুলকে তারা বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ ও খেলাধুলার উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করে। অনেক সময় স্কুলের জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন করে এবং চুরি করে নিয়ে যায়। এইরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতি শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। স্কুলের প্রতি স্থানীয় সমাজের এ ধরনের মনোবৃত্তি খুবই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক।

অধিকাংশ স্কুলে উপকরণের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই উপকরণের মধ্যে রয়েছে স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র, খেলার মাঠ ইত্যাদি। অধিকাংশ স্কুলে শ্রেণীকক্ষের আয়তনের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি থাকে। ফলে ছাত্ররা এক বেঞ্চে ঠাসাঠাসি করে অনেক জন বসে। অনেক সময় ছাত্ররা দাঁড়িয়েও থাকে। প্রয়োজনীয় গৃহ বা কক্ষের অভাবে শ্রেণীকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা সম্ভব হয় না। নির্দিষ্ট নিয়মের তুলনায় ছাত্র সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য শিক্ষকের পক্ষেও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া অধিকাংশ স্কুলে প্রয়োজনীয় খেলার মাঠ, লাইব্রেরী প্রভৃতির অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২। শিক্ষোপকরণের অভাব ঃ প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণের অভাবেও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ বলতে পাঠ্যপুস্তক, ব্লাকবোর্ড, মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব, প্রোজেকটর, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি বুঝায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলে এই সমস্ত উপকরণের একান্ত অভাব। তাছাড়া যে

www.pathagar.com

সমস্ত উপকরণ রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধাজনিত কারণে সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না।

৩। **স্কুলের অবস্থান ও পরিবেশগত অসুবিধা ঃ** স্কুলের অবস্থানও অনেক সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। স্কুল সব সময় জনকোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। প্রান্তর, নদ-নদী ও লোকালয় থেকে দূরে স্কুলের অবস্থান হলে ভাল হয়। হাট, বাজার, বড় রাস্তার ধার, জনবহুল লোকালয়, নিচু জায়গায়, জলাভূমির ধারে প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। কারণ এই সমস্ত জায়গায় সব সময় হৈ, চৈ হট্টগোলে পূর্ণ থাকে। বড় রাস্তার ধারে সব সময় লোকজন ও যানবাহনের শব্দে ও গণ্ডগোলে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া খুব নিচু জায়গায় বা জলাভূমির ধারে অবস্থিত হলে স্কুল প্রাঙ্গণ সব সময় ভিজা ও সেঁতসেঁতে বা পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। আমাদের দেশের অনেক স্কুল এই সমস্ত হাট বাজার, গঞ্জ, বড় রাস্তার ধার, নিচু জায়গায় অবস্থিত যার ফলে এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪। **ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যসূচী ঃ** বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি জাতীয় দর্শন এবং সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী প্রণীত হয়নি। এই পাঠ্যসূচিত সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন মিল নেই। জাতীয় মিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্টে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো আজও বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। গতানুগতিক পাঠ্যক্রম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি তথা সমাজের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না। তাছাড়া এই পাঠ্যসূচী বৃত্তিমূলক, শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রীক নয়। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিফলন পাঠ্যসূচিতে থাকা প্রয়োজন।

৫। **গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ** গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি মাধ্যমিক শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেট সর্বস্ব। যে কোন উপায়ে হোক পরীক্ষায় পাশ করাই উদ্দেশ্য। প্রচলিত এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থী পরীক্ষা পাশের জন্য বিষয়বস্তু না বুঝে তোতা পাখির মত বই পুস্তক মুখস্ত করে নোট বইয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অসদুপায় অবলম্বনে তৎপর হয়। এই ধরনের পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্ভব হয় না।

৬। **চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকের অভাব ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। যার ফলে শিক্ষাদান কার্যে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এর মূলে রয়েছে স্কুলের আর্থিক সংকট। এই শিক্ষক–স্বল্পতার জন্য প্রায় প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিদিন অনেক সময় সবপ্রিয়ডই নিতে হয়। এর ফলে যথাযথভাবে শিক্ষাদান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৭। **যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ঃ** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান কার্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা শিক্ষাগত ও পেশাগত দক্ষতার দিক দিয়ে দুর্বল। এইসব শিক্ষকগণ শ্রেণী কক্ষে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করতে পারেন না। ফলে ছাত্রদের এইসব শিক্ষকের ক্লাশের প্রতি

www.pathagar.com

কোনরূপ আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে বিশৃংখলার কারণ হয়ে দেখা দেয়।

৮। **ম্যানেজিং কমিটির কর্তৃত্ব ঃ** আমাদের দেশে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির কর্তৃত্ব অপরিসীম। অধিকাংশ স্কুলে এই কমিটির অযথা হস্তক্ষেপের ফলে স্কুল পরিচালনায় বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ম্যানেজিং কমিটির অনেক সদস্য আছেন, যাঁরা শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সব সময় বিভিন্ন ধরনের উস্কানীর মাধ্যমে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের অহেতুক দ্বন্দ্ব কলহ লেগেই থাকে।

৯। **স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব ঃ** অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের কার্যাবলীতে স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের অহেতুক হস্তক্ষেপ এবং কর্তৃত্ব শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে ব্যাহত করে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো রাজনীতির আখড়া। এরা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

১০। **চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব ঃ** অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকদের অনেক সময় ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদদের মন যুগিয়ে চলতে হয়। অনেক সময় শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন প্রকার রাজনীতির ফাঁকে ফেলে জোরপূর্বক চাকুরীতে ইস্তফা (Resignation) দিতে বাধ্য করা হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে ভুরি ভুরি রয়েছে।

১১। **শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার অভাব ঃ** আমাদের দেশে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা খুব কম। সাধারণ কোন শিক্ষকদেরকে অন্যান্য চাকুরীজীবীদের তুলনায় ছোট মনে করে। অধিকাংশ স্কুলের আর্থিক সংকটজনিত কারণে শিক্ষকদের বেতনও তেমন আকর্ষণীয় নয়। তাছাড়া যে বেতন পান তাও নিয়মিত নয়। ফলে ভাল শিক্ষক এই পেশা গ্রহণ করতে চান না। যারা অন্য চাকুরী না পেয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা অন্যত্র চাকুরী যোগাড়ে ব্যস্ত থাকেন অথবা বাড়তি রোজগারের জন্য অন্য কাজে (Subsidiary business) ব্যস্ত থাকেন-পরিপূর্ণভাবে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন না।

১২। **পরিদর্শনের স্বল্পতা ঃ** অনেক সময় পরিদর্শনের অভাবে স্কুলের কাজকর্মের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয় না। এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে কয়েক বছর যাবত কোন পরিদর্শক পরিদর্শন করেননি। ফলে স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সুষ্ঠু নিয়মনীতি বিষয়ক কোন নির্দেশনা এবং ত্রুটির সংশোধন হওয়া সম্ভব হয় না। মাঝে মাঝে পরিদর্শন দ্বারা স্কুলের নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটিও সংশোধিত হয়।

১৩। **শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ঃ** শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর একটি স্বাভাবিক রীতি। অধিকাংশ স্কুলে দুটি দল থাকে-একটি প্রধান শিক্ষকদের দল এবং অপরটি সহকারী শিক্ষকদের দল। প্রধান শিক্ষকদের প্রতিটি কাজে বাঁধা প্রদান এবং অসুবিধার সৃষ্টি করাই অন্য দলটির উদ্দেশ্য। আর এই দলাদলির

www.pathagar.com

কাজে সমর্থন যোগায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকবৃন্দ। অনেক সময় ছাত্রদেরকেও এই দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হয়। এই দলাদলি শিক্ষার পরিবেশকে দারুণভাবে কলুষিত করে।

১৪। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা ঃ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা যেমন আর্থিক ও পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা পান, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা সেইরূপ সুযোগ সুবিধা পান না। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের যেমন ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের মন যুগিয়ে চলতে হয়-সহকারী স্কুলের শিক্ষকদের তেমন কোন বালাই নেই। ফলে বিভিন্ন কারণে সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মনে একটা অনীহাভাব বিদ্যমান থাকে যা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

১৫। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঃ বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সুসম্পর্কের উপর। বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সুনাম অর্জনের ক্ষেত্রে এই উপাদানের কোন যোগাযোগ বা সুসম্পর্ক নেই বললেই চলে। অধিকাংশ শিক্ষক অভিভাবককে চেনেন না এবং অভিভাবক শিক্ষকদের চিনেন না বা কখন স্কুলে যান না। অথচ শিশুর শিক্ষাদানে এই উভয়ের সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহার ঃ আমাদের দেশে অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে উল্লেখিত সমস্যাগুলো বিরাজমান। স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ক্ষেত্র এই সমস্যাগুলো দূর করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোন একক প্রচেষ্টায় এই সমস্ত অসুবিধা দূর করা সম্ভবপর নয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজকে সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়

ভূমিকা ঃ স্কুলের সুষ্ঠু শিক্ষাদানে সমস্যা ও ত্রুটিগুলির নিরসন একান্তভাবে কাম্য। কারণ স্কুলের শিক্ষাদানে যে কোন সমস্যা শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করে। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সমস্যাগুলোর দূরীভূত না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে কখনও সাফল্য আসবে না। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সমস্যা দূরীকরণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

১। **শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন। কারণ চাকুরীর নিরাপত্তা না থাকলে শিক্ষকরা শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না। বিনা কারণে বা সামান্য কারণে শিক্ষকদের চাকুরীচ্যুত করা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২। **আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা দান ঃ** বিরাজিত সমস্যা সমাধান করে শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা দান করতে হবে এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। বেসরকরী স্কুলের শিক্ষকরা সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় খুব কম বেতন পান। তাছাড়া ভাল শিক্ষিত ব্যক্তি এই স্বল্পবেতন হেতু শিক্ষকতা করা অপেক্ষা অন্য চাকুরী করাই পছন্দ করেন। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক মর্যাদা দানের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ঃ** স্কুলে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের রিফ্রেসার কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য সুযোগ দান করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকেরা আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করতে পারেন। শিক্ষকেরা নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এর মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

৪। **শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি দূরীকরণ ঃ** অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে এই সমস্যা বিদ্যমান যা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করে। প্রায় প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষকেরা প্রধান শিক্ষকদের দল এবং অন্যান্য শিক্ষকদের দল এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রচারণায় লিপ্ত হয়। এ কাজে ইন্ধন যোগায় জনসাধারণ ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররাও এই দলে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দলাদলি অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষকদের এ ধরনের মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত।

www.pathagar.com

৫। ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অহেতুক হস্তক্ষেপ বন্ধ করুন ঃ স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের অহেতুক হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে পড়াশুনার স্বাভাবিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করে এবং হেডমাষ্টারের কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে তৎপর হয়। শিক্ষকরা সব সময় তাদের করুণার পাত্র হয়ে থাকে এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের মন যুগিয়ে চলুক এটাই যেন তাদের মনোভাব। স্কুল পরিচালনায় এই ধরনের মনোভাব কখনও কাম্য নয়।

৬। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় সামাজিক পরিবেশকে সুন্দর করতে হবে। স্কুলের আশেপাশের জনসাধারণ যাতে স্কুলের সম্পত্তিকে নিজস্ব সম্পত্তি বলে রক্ষণাবেক্ষণ করে সেজন্য তাদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে যাতে অহেতুক দলাদলি বা বিভেদ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সব শিক্ষকদে উদার মনোভাবের পরিচয় দান করতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পর মিলামিশা, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবার মতামত গ্রহণ এবং সাপ্তাহিক মিটিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাই যদি খোলামনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করেন, তাহলে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা দূর করা সম্ভবপর হবে।

৭। পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন ঃ মাধ্যমিক স্কুলে বিরাজিত সমস্যা দূরীকরণে পাঠ্যসূচীর সংস্কারসাধন প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তর আমাদের দেশের জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং অধিকাংশের জন্য শেষ শিক্ষা। এজন্য মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক বা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে শিক্ষার্থীরা এই স্তরে পড়াশুনা শেষ করার পর চাকুরীর উপর নির্ভর না করে যে কোন পেশা অবলম্বন করে জীবিকার্জনে সক্ষম হয়। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও এই স্তরের পাঠ্যসূচিতে পেশাগত শিক্ষা সংযোজনের কথা বলা হলেও বাস্তবে এখনও তা কার্যকরী হয়নি। বর্তমান পাঠ্যসূচির সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন সমাঞ্জস্য নেই। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যক বিষয় হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করলে যে সমস্ত শিক্ষার্থী শেষ স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে না– তাদের জন্যেও নিম্নশ্রেণী থেকে অর্জিত পেশাগত অভিজ্ঞতা জীবিকার্জনের সহায়ক হবে।

৮। পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঃ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রচলিত পদ্ধতি দ্বারা ছাত্রদের যোগ্যতা যাঁচাই করা সম্ভব হয় না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত মুখস্থ এবং সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্যেসীমাবদ্ধ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানার্জন। পরীক্ষার এই পদ্ধতি পরিবর্তন না করলে শিক্ষাব্যবস্থার কখনও উন্নতি হবে না। পরীক্ষার এই ব্যবস্থা যে উপায়েই হোক ছাত্রদের পরীক্ষায় পাস আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯। পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ মাধ্যমিক স্কুলে বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণে পরিদর্শনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিদর্শক স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষাদানের বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো নির্ণয় করতে পারেন এবং সেগুলো নিরসনের

www.pathagar.com

জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দান করতে পারেন। প্রধান শিক্ষক সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারেন। অনেক সময় প্রধান শিক্ষক নিজের কাজের ভুলত্রুটিগুলো বুঝতে পারেন না। তাছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে নির্দেশনা দান করা হয়, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই তৎপর হন।

১০। বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ঃ স্কুলের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ প্রভৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শ্রেণীকক্ষ যদি ছোট হয়, তাহলে শিক্ষাদানের সমস্যার সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনমত আসবাবপত্রও থাকা দরকার। তা না হলে ছাত্ররা এক বেঞ্চে অনেকজন বসে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে, পাঠে মনোযোগ দেবে না এবং পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া কলহে লিপ্ত হবে। শিক্ষাদান কার্যকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া স্কুলে যদি খেলার মাঠ, বাথরুম ইত্যাদি না থাকে তাহলেও অনেক দিক দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মোট কথা স্কুলের বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১১। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ ঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের স্কুলগুলোর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যগুলো দূর করতে হবে। সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা যেমন পরিবেশগত, বস্তুগত, আর্থিক ও চাকুরীর নিরাপত্তাজনিত সুযোগ-সুবিধা পান, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা তেমনি পান না। ফলে তাদের মনে সবসময় একটা হীনমন্যতাবোধ ও অনীহাভাব জেগে থাকে। তাদের আর্থিক দৈন্যতা আছেই, তাছাড়া চাকুরীর কোন নিরাপত্তা নেই?। সব সময় তাদের ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের করুণার পাত্র হয়ে থাকতে হয় এবং তাদের মন যুগিয়ে চলতে হয়।

১২। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঃ সর্বশেষে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত করতে হলে এবং বিরাজমান সমস্যাগুলো দূর করতে হলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। এই ত্রিমুখী সম্পর্কের উপর স্কুলের সাফল্য নির্ভর করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে এবং অভিভাবক সম্মেলন, সভাসমিতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার করতে পারেন। এর ফলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনাজনিত উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধান করা সহজতর হবে।

উপসংহার ঃ উপসংহারে বলা যায়, আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার আবর্তে নিপতিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত সমস্যাগুলো শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্য যে, এই সমস্ত সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে জাতীয় উন্নতি কখনও সম্ভব হবে না। তবে একথাও সত্য যে, কোন একক প্রচেষ্টা দ্বারা এই সব সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাজ ও সরকারকে এ ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধু নীতিবাক্য এবং বক্তৃতা দ্বারা এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না।

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে এন. সি. টি. বি-এর ভূমিকা

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও বিস্তরণের ক্ষেত্রে NCTB যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাক্রম হল একটি শিক্ষা ব্যবস্থার হৃদপিন্ড। শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে শিক্ষাক্রমকে সচেতন ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ

১. পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন, বিতরণ ও শ্রেণী কক্ষে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
২. শিক্ষাক্রম দলিল এবং সহায়ক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য বিতরণ।
৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ।
৪. চাকরিরত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকর্ম কর্তাদের প্রশিক্ষণ।
৫. চাকরি পূর্বকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
৬. শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার।
৭. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যাবলী পরিবিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।

১। পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন ও বিতরণ ঃ নতুন শিক্ষাক্রমের চাহিদা মাফিক নতুন আঙ্গিকে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা করে NCTB। পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তীতে পাণ্ডুলিপিসমূহ সম্পাদনার পর প্রকাশিত হয় এবং শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়া হয়।

২। শিক্ষাক্রম দলিল ঃ সম্পাদনার কাজ শেষ হলে ছাপা হবার পর একটি সংশ্লিষ্ট সবার কাছে বিতরণ করা হয়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করে বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালান হয়।

৩। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ঃ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম NCTB বিভিন্নভাবে করে থাকে। Cascade পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য একটি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাক্রম দলিল ও পাঠ্যপুস্তকের খসড়া পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে Master Trainer-দের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর আওতায় দ্বিতীয় পর্যায় Master Trainer বৃন্দের দ্বারা Core Trainer দের তৃতীয় পর্যায় Core Trainer-দের দ্বারা Field Trainer বৃন্দ কর্মরত শ্রেণী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়।

৪। কর্মরত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্ম-কর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দুটি ন্যূনতম পূর্বশর্ত হচ্ছে— (ক) Well Qualified Adequately Trained, Devoted and Highly Motivated Teaching Force এবং (খ) নতুন শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতকৃত শিখন সম্পদ (Learning Resources) । তাই বলা চলে শিক্ষাক্রম সফল বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণকে দু'ভাগে বিভক্ত করে বিবেচনা করা যায় ঃ

www.pathagar.com

১। কর্মরত শিক্ষকদের স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ ঃ এই চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের দু'টি উদ্দেশ্য— (i) নতুন শিক্ষাক্রম শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ ও (ii) শিক্ষাক্রমের Philosopy Rational এবং বিশেষ বিশেষ দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা ও Orientation দেওয়া। এই উদ্দেশ্য দু'টি একটি অপরটির সম্পূরক ও পরিপূরক।

২। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের Initial প্রশিক্ষণ ঃ যেহেতু এই প্রশিক্ষণ দীর্ঘমেয়াদি এবং একটি সমন্বিত Academic ও Professional কোর্স, তাই এই প্রশিক্ষণের জন্য যে শিক্ষাক্রম ব্যবহৃত হবে তাতে মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন থাকতে হবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম স্কুল শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিক ও বৈশিষ্ট্য প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে তুলে ধরে। স্কুল শিক্ষাক্রম যদি নতুন Teaching-Learning strategy দাবি করে তবে এ সকল Strategy প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অঙ্গ হবে। যেমন ঃ নতুন শিক্ষাক্রম Problem-solving বা Inquiry Approach to learning-এর উপর জোর দেওয়া থাকলে Teaching Practiece -এ তা প্রতিফলিত হতে হবে।

শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন সামগ্রী বা শিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত করা, এগুলোর যৌক্তিক মূল্যায়ন ও শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা জরুরী। তেমনি চাকুরীরত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান অত্যাবশ্যক। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সকল দিকের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান না হলে বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং এর দরুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত Impact সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

নতুন স্কুল-শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী নতুন শিখন সামগ্রী NCTB -এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষাক্রম বিতরণ কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান NCTB, HSEP এবং SEDP-এর কর্মকর্তাদের যৌথ দায়িত্বে সম্পন্ন হয়।

চাকুরীরত শিক্ষক ও সম্পৃক্ত অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব NCTB-এর উপর।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা এবং শ্রেণী শিক্ষকের দায়িত্ব

বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার শ্রেণী ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিদ্যালয় কাঠামোর সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান হল শিক্ষার্থী এবং যে স্থানে তাদের শিক্ষাদান কাজ সংগঠিত হয়ে থাকে তা হল শ্রেণীকক্ষ। আসলে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যাবলিই শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আবর্তিত। তাই শ্রেণীকক্ষের পরিবেশের ওপর বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকে তার সিংহভাগ সময়ই কাটায় শ্রেণীকক্ষে এমন কি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমেরও বেশির ভাগ অংশ হয় শ্রেণীকক্ষেই। মূলতঃ শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ওপর শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ ও কার্যক্রম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতে শ্রেণীকক্ষের সুবিধাদি এবং এর সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিচালনা শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ শ্রেণী ব্যবস্থাপনা হল বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু।

শ্রেণীকক্ষে শৃংখলা রক্ষার উপায় বা কৌশল

১। শ্রেণীতে শৃংখলা রক্ষার প্রধান এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল শিক্ষক পূর্ণ পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণীতে আসা এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করা। কারণ শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ আকর্ষণীয় হলে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও শিক্ষার্থীরা শ্রেণী পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকে।

২। শ্রেণীতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। মূলতঃ এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান ও প্রত্যক্ষ। শিক্ষক সক্রিয় না থাকলে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় থাকবে। ফলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

৩। মানুষ সজাগ অবস্থায় তার ব্রেন কখনও বসে থাকে না, কোন না কোন কাজ করবেই। তাই শিক্ষার্থীরাও কোন কাজ ছাড়া চুপ করে বসে সময় কাটাতে পারে না। অবসরে বসে থাকলে কিছুটা দুষ্টুমী এবং বিশৃঙ্খলা করাটাই স্বাভাবিক। কাজেই পাঠদানের পর হাতে সময় থাকলে পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

৪। শ্রেণীতে শিক্ষকের অবস্থান এমন স্থানে হবে যাতে শ্রেণীর সকলে সহজেই তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে পারে এবং শিক্ষকও সকল শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখতে পারেন।

www.pathagar.com

৫। শিক্ষককে একই অবস্থানে স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে বা বসে পাঠদান করা উচিত নয়, প্রয়োজনে তাঁকে Movement করতে হবে। এটা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অন্যতম সহায়ক।

৬। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের খাতার লেখা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের আসনের নিকট গিয়ে তা সংশোধন করা উচিত। শিক্ষক নিজ আসনে বসে শিক্ষার্থীদের খাতা সংশোধন করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা টেবিলের পাশে ভিড় করে বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে।

৭। শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে, পাঠের উপযোগী উপকরণের যথার্থ ব্যবহার করাতে হবে এবং শ্রেণী পরিচালনার ব্যাপারে সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষককে শ্রেণীতে আসতে হবে।

সুতরাং শ্রেণীকক্ষে শৃংখলা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হল পরিবেশ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কর্তব্য শ্রেণী উপযোগী শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং সময় উপযোগী যথোপযুক্ত শিক্ষাদান বা পাঠদান কৌশল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলি যদি শিক্ষার্থীদের ভাল লাগে, মন ছুঁয়ে যায় বা মনকে আকৃষ্ট করে তাহলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষিত এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত আচরণ বা কার্যাবলির প্রতি, আর শ্রেণী থাকবে শিক্ষকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

আদর্শ শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্য অথবা শ্রেণীকক্ষের আকার, আয়তন, আসবাবপত্র, শিক্ষার্থীদের আসন ও আলো বাতাসের ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি। মনোরম পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। একটি আদর্শ শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

১। শ্রেণীকক্ষের আয়তন শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে হতে হবে। তবে শ্রেণীকক্ষের আকার ও আয়তন এমন হতে হবে যাতে ৪০ জন শিক্ষার্থী একত্রে বসতে পারে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের শর্তানুসারে ১১ বছরের বেশি বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীতে জন প্রতি ১২ বর্গফুট জায়গা নির্দিষ্ট করা এবং শ্রেণীর আয়তন সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থীর উপযোগী হতে হবে।

২। শ্রেণীকক্ষের উচ্চতা বেশি থাকবে এবং প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকবে। দরজা, জানালার সংখ্যা বেশি এবং জানালাগুলো বড় বড় থাকবে। দরজা, জানালাগুলো উত্তর-দক্ষিণে খোলা থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে বৈদ্যুতিক পাখা, বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৩। শ্রেণীকক্ষগুলো বর্গাকার না হয়ে আয়তক্ষেত্রাকার হবে।

৪। শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজন মত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজবুত ও হালকা আসবাবপত্র থাকবে। শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ বা ডেস্ক একটার পর একটা পর পর সাজিয়ে বসাতে হবে। শিক্ষার্থীদের আসন এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে যে কোন

www.pathagar.com

আসন হতে শিক্ষকের অবস্থান এবং ব্লাকবোর্ড বা চকবোর্ড স্পষ্ট দেখা যায়। এছাড়া বেঞ্চ বা ডেস্কগুলো নড়াচড়া করার উপযোগী হবে।

৫। শিক্ষার্থীদের বসার আসনগুলোর উচ্চতা তাদের উচ্চতা অনুপাতের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। শ্রেণীকক্ষে যে দিক দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো প্রবেশ করে সে দিকে মুখ করে শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা রাখা ঠিক নয়। এতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের লেখা স্পষ্ট দেখতে পারবে না। এছাড়া এতে চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

৭। শ্রেণীকক্ষের মেঝে, দেয়াল, ছাদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৮। প্রত্যেক শ্রেণী বা শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত রাখা দরকার। মাধ্যমিক স্তরের প্রতি শ্রেণী বা শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৪০ জন। কোন অবস্থাতে এ সংখ্যা ৫০ অতিক্রম করতে দেয়া ঠিক নয়।

৯। শ্রেণীকক্ষ তথা বিদ্যালয় গৃহ জনকোলাহল মুক্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাজার, রেল স্টেশন, স্টীমার স্টেশন, নদীর ঘাট, অফিস আদালত, রাজপথ ইত্যাদি থেকে বিদ্যালয়ের অবস্থান বেশ কিছুটা দূরে থাকা উচিত।

১০। শ্রেণীকক্ষসমূহের মাঝের দেয়াল বা পার্টিসন এমন হওয়া উচিত যাতে এক কক্ষের শব্দ অন্য কক্ষের শিক্ষার্থীদের মনোযোগের বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। এ দেয়াল নাড়াচাড়া করার উপযোগী হওয়া উচিত যাতে প্রয়োজনমত শ্রেণীকক্ষের আকার ছোট বা বড় করা সম্ভব হয়।

শ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষক যে সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন :

শ্রেণী শিক্ষাদান কার্যক্রমে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককে যে সমস্ত উপাদানকে যত্নসহকারে বিবেচনা করতে হবে এমন কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। শিক্ষার্থীদের বয়স, উচ্চতা, শারীরিক দুর্বলতা, দৃষ্টিহীনতা, কানে কম শোনা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের বসার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

২। শিক্ষাদান কাজের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা পর্যবেক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই শ্রেণী পরিচালনায় শিক্ষককে এ দিকে সতর্ক দৃষ্ট রাখতে হবে।

৩। শ্রেণীকক্ষে শ্রেণী শিক্ষকের অবস্থান এমন স্থানে হবে যাতে তিনি সকল শিক্ষার্থীর ওপর নজর দিতে পারেন।

৪। শিক্ষকের পাঠদান আকর্ষণীয়, সজীব, আনন্দদায়ক, সাবলীল ও সৃজনশীল হলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সহজ ও ফলপ্রসূ হবে।

৫। শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দলনেতা নির্বাচন এবং তার সাহায্য গ্রহণ করা শ্রেণী পরিচালনায় অত্যন্ত সহায়ক।

৬। শ্রেণীতে অমনোযোগী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রথমে দুষ্টুমীর বা চঞ্চলতার কারণ

www.pathagar.com

সনাক্ত করতে হবে তার পর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শাস্তি দিয়ে তাদেরকে শ্রেণীতে মনোযোগী করা যাবে না।

৭। মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং তাদের কাজের ভালমন্দ অনুসারে প্রশংসা বা ভুল শোধরানোর উপায় বলে দিতে হবে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রশাসন এবং পরিচালনার মূলনীতি

সব ধরনের বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি একই রকম নয়। বিদ্যালয় ভেদে এর কিছুটা পার্থক্য থাকে। পার্থক্য থাকলেও বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ অনেক এবং এর পরিধি ও বেশ বড়। তাই বিদ্যালয় প্রশাসনিক কার্যাবলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রথম অধ্যায়ে প্রশাসনিক কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিদ্যালয় প্রশাসনের মূল বা প্রধান কার্যসমূহের উল্লেখ করা হল। কারণ এ প্রধান বা মূল কাজগুলোর মধ্যেই নিহিত বিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যান্য বিভিন্ন কার্যসমূহ। এ কাজগুলোরও পরস্পর সম্পর্কিত। যেমন

পরিকল্পনা →সংগঠন →নিয়ন্ত্রণ → মূল্যায়ন। বিদ্যালয় প্রশাসন প্রক্রিয়া ও কাজ এবং কাজগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ত নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

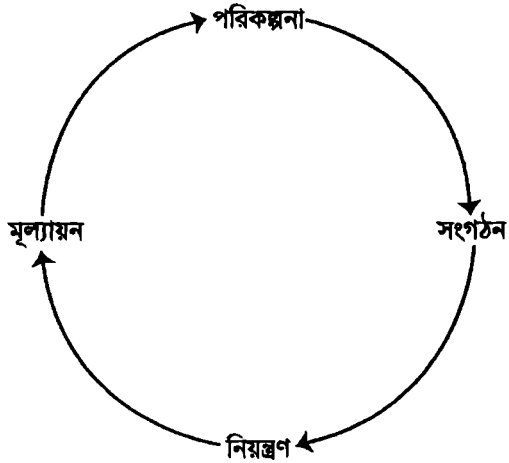

এখন আলোচনায় আসা যাক বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পরিধি সম্পর্কে। বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আওতার মধ্যে রয়েছে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক ও কর্মী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক-ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার ও ছাত্রাবাস, আবাসিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এখানে স্মরণ রাখতে

www.pathagar.com

হবে যে, প্রশাসনের কার্য সমাধা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেমন প্রয়োজন তেমনি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক লোকের অংশ গ্রহণ তুলনামূলকভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকর। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজ কম সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে কিন্তু ব্যবস্থাপনার কাজে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োজন।

বিদ্যালয় পরিচালনার মূলনীতি

নীতিমালা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যেও বিভিন্ন নীতিমালা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল নীতি বা নীতিমালা কি? সাধারণভাবে নীতি হল একটি বিবৃতি যা কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনে নির্দেশিকার কাজ করে। তবে একটি বিবৃতিকে তখনই নীতি হিসেবে গণ্য করা যায় যখন তা স্থান, কাল ভেদে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ নীতি বা নীতিমালা একদিনে তৈরি হয় না, বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে এবং বিদ্যালয় পরিচালনার দীর্ঘ দিনের গড়ে ওঠা কাঠামো, স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম-কানুন ও অভিজ্ঞতার ফলপ্রসূ ব্যবহার ইত্যাদি স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি হিসেবে কাজ করে থাকে।

আবার বিদ্যালয় সংগঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় কোন সাধারণ পরীক্ষিত সত্যকে বিদ্যালয় পরিচালনার মূলনীতি বলা যায়। তবে সব অবস্থাতেই এবং সব সময় যে একই নীতি কার্যকর হবে তা নয় বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময়ে যা কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় তাকে নীতি বলে গণ্য করা যায়। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালার প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

১। দায়িত্ব বন্টন ও বিন্যাস ঃ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব পালন করা একক কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রেও প্রধান শিক্ষকের পক্ষে একা সকল দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। তাই প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক, এমনকি কখনও শ্রেণী প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিলে যেমন কাজের মান ঠিক থাকে তেমনি বিদ্যালয় পরিচালনায় দক্ষতারও বিকাশ ঘটে। এ দায়িত্ব বন্টন ছাড়াও বিদ্যালয়ের কাঠামো এমনভাবে বিন্যাস করা উচিত যাতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দ্রব্যাদি রাখার জন্য বিশেষ স্থান রক্ষিত থাকে।

২। ক্ষমতা ও দায়িত্ব বন্টন ঃ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দায়িত্বের তুলনায় ক্ষমতা বেশি হলে যেমন এর অপব্যবহার হবে ঠিক তেমনি দায়িত্বের তুলনায় ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হলে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। তাই দায়িত্ব এবং ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য রেখে প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন।

৩। আদেশ ও নির্দেশনার ঐক্য ঃ আদেশ ও নির্দেশনার সাথে ঐক্য রেখে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বন্টন করতে হবে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মূল আদেশদাতা হলেন প্রধান শিক্ষক যিনি একাই আদেশ প্রদানের দায়িত্ব বহন করবেন। অন্যথায় কাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

৪। **সহযোগিতা ও দলগত প্রচেষ্টা ঃ** বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সকলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা এবং অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি সম্ভব। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যাতে করে দলগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলেই কাজ করতে পারেন বিদ্যালয় পরিচালনায় সে সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৫। **সমন্বয় সাধন ঃ** বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা একটি সমষ্টিগত ব্যাপার। বিদ্যালয় পরিচালনায় দক্ষতা আনয়নের জন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি ও কাজের মধ্যে ঐক্য আনা প্রয়োজন।

৬। **শৃঙ্খলা ঃ** শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও প্রশাসকের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও বিধি মেনে চলার মধ্যে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নিহিত। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে শাস্তির বিপরীতে পুস্কারেরও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৭। **সাম্য ঃ** বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সকল স্তরের কর্মচারীদের প্রতি সমব্যবহার, সুবিচার, সহানুভূতি, দয়া প্রদর্শন প্রভৃতি অন্যতম প্রধান নীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮। **সম্পদ ঃ** বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম সম্পদ থাকে। এ সম্পদের কোনটি যেন কোন ভাবে অপব্যবহার না হয়ে বরং সঠিক ব্যবহার হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সম্পদের যথার্থ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।

৯। **চরিত্র গঠন, দক্ষতা সৃষ্টি এবং সার্বিক কল্যাণ ঃ** বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিশুরা সমাজের এবং দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং বিদ্যালয় প্রশাসন সর্বদা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, সামাজিক দক্ষতা অর্জন এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে।

১০। **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ** বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গঠনের সহায়ক হওয়া আবশ্যক।

১১। **নিয়মানুবর্তিতা ঃ** বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল কাজ যথাসময়ে সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

১২। **উদ্যোগ ঃ** প্রধান শিক্ষক তাঁর অধীনস্থ সকলকে কর্ম ক্ষেত্রে উদ্যোগী করবেন। কারণ উদ্যোগ ও প্রজ্ঞার নীতি বিদ্যালয় পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের সহায়ক।

১৩। **নেতৃত্ব ঃ** প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের কার্যাবলিতে গঠনমূলক নেতৃত্ব দিতে হবে।

১৪। **যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ** বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিষয় শিক্ষকদের এবং বিষয় শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

১৫। **যোগাযোগ রক্ষা ঃ** বিদ্যালয় পরিচালনায় কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা রক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যোগাযোগের সাথে বিজড়িত রয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশের মাধ্যমিক। শিক্ষা কাঠামোকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায় যেমন ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, নবম ও দশম শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। কাজেই বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর এই দ্বিতীয় স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অবস্থান করছে কোমল মতি ছেলে মেয়েরা যাদের বয়স ১১ হতে ১৭ +। এটা হচ্ছে কৈশোর এবং শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিবর্তন ও বিকাশদান। এবং মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বব্যাপী মানসম্পন্ন শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন ও উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নাই। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে আজকাল আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একথার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার যে উন্নয়ন ঘটেছে এর মূল কারণ আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। পক্ষান্তরে আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে দ্বিতীয় পূর্ব শর্ত।

একজন মানুষে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তবে প্রথম জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই মূল শিক্ষা যার ফল সমস্ত এইস্তরে শিক্ষার্থীরা থাকে ভাবপ্রবন ও অনুকরণশীল যা সঠিক শিক্ষা ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে কাজে লাগানো একান্ত আবশ্যক, অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা 'মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং মতামত প্রবন্ধে লিখেছেন।'

বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেককে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ করে অথবা পড়া-শুনা ত্যাগ করে অর্থ-উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহের কাজে প্রবেশ করতে হয়। এই সমস্ত কারণে অনেক শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা একটি প্রান্তিক শিক্ষা স্তর। আবার অপর দিকে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব। কাজেই দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোর এই স্তরটি একদিকে যেমন উচ্চ শিক্ষা লাভের পথকে প্রশস্ত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে অন্যদিকে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত শিক্ষার স্তর হিসাবে নৈতিক, বৃত্তিগত ও বৌদ্ধিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি দিক দিয়ে সুশিক্ষিত, পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যক্ষম মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করে।

এমতাবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলিকে এই সকল বহুবিধ দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরী যার জন্য প্রয়োজন একটি স্বয়ংসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটবে, উচ্চ শিক্ষার 'ভিত' তৈরি হবে এবং

www.pathagar.com

কর্মজীবী মানব সম্পদের রূপান্তরিত হওয়ার শারীরিক, মানসিক এবং মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধসহ মৌলিক শিক্ষা পাবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রান্তিক এবং অধিকাংশের শিক্ষা হিসেবে এই শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং ব্যক্তি ও নাগরিক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য শারীরিক, বুদ্ধিগত ও বৃত্তিগত দিক দিয়ে সুশিক্ষিত করে তোলা। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃত্তিমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। **শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষা হবে অনুপ্রেরণামূলক যা শিক্ষার্থীর সুপ্ত জ্ঞানের প্রতিভা বিকাশিত হয়।

একজন শিক্ষার্থী যখন অজানাকে জানার প্রেরণা লাভ করে তখন বাস্তব জীবনে উন্নতি এবং কল্যাণ সাধন করতে পারে।

২। **স্বাধীন মত প্রকাশ ঃ** মানুষ কখন ও পরাধীন জীবন যাপন করতে চায় না। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীন মত প্রকাশ এবং চিন্তাশক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। বিশেষ এবং চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা না পেলে মত প্রকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু চিন্তাশক্তির মানুষের সৃজনী শক্তির ক্ষমতার মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

৩। **শিক্ষার্থীকে সুনাগরিকের পরিণত ঃ** আজকের কোমল মতি শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব। তাদের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে স্কুলের উপর। একজন শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাঁর জ্ঞানের বিকাশ সাধনে সহায়তা দান করা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

৪। **সঠিক পথে চলার অনুপ্রেরণা ঃ** একজন শিক্ষিত এবং বিবেকমান ব্যক্তি মাত্রই সঠিক পথে চলার আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজে নেতৃত্বদান করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে পথ চলার অনুপ্রেরণা দান করা।

৫। **জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবোধ ঃ** জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চেতনাবোধ যে কোন নাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। যে জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নেই, সে জাতি পৃথিবীতে পরপদানত জাতি বা ক্রীতদাস বলে পরিগণিত। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

৬। **শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন ঃ** শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। "সুস্থ দেহে সুস্থ মন"- এ প্রবাদ বাক্যটি চিরন্তন সত্য। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও কখনও সুস্থ থাকে না। অসুস্থ মানুষ কখনও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না

www.pathagar.com

এবং তার দ্বারা মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অধিকারী নাগরিক তৈরি করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শরীর চর্চা ও আমোদ-প্রমোদমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৭। **চরিত্র গঠন ঃ** চরিত্র মানুষের মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখে। যে সমস্ত মানুষ সমাজের কল্যাণ সাধন করে গেছেন এবং বিশেষ গুণের জন্য অমর হয়ে রয়েছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ। ছাত্র জীবনেই চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সৎ চরিত্র গঠন। ত্যাগ, সংযম, ধৈর্য, সাধুতা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণ প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে এই মাধ্যমিক স্তর।

৮। **প্রয়োজন ও চাহিদার সমন্বয় বিধান ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষার অপর লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদার নিবৃত্তি। এই প্রয়োজন ও চাহিদা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই প্রয়োজন ও চাহিদা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সুতরাং এই মাধ্যমিক স্তরে এমন শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনে যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারে।

৯। **আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাব গঠন ঃ** পরোপকার মানুষের পরম ধর্ম ও মহৎ গুণ। সমাজে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে হলে আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাবের প্রয়োজন। নিজের সুখ-শান্তির সঙ্গে অপরের সুখ-সুবিধা বিধান করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। স্বদেশ প্রেম, মানবপ্রীতি, সেবাপরায়ণতা, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলীর অধিকার হওয়ার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী বিকাশের মনোভাব জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।

১০। **বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ঃ** জীবিকার্জনের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা লাভের একান্ত প্রয়োজন। পুঁথিগত বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কাজে আসে না এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে এবং জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ হচ্ছে এই স্তরে শিক্ষার্থীর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনে সক্ষম করে তোলা।

১১। **বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাবে গঠন ঃ** সমগ্র বিশ্ব মিলে আজ একটি সমাজ। কোন রাষ্ট্রই সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না। কোন না কোন দিক দিয়ে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই আজ একে অপরের সন্নিকটবর্তী হচ্ছে এবং U. N. O.-এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র দেশ 'এক দুনিয়ার আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং একজন নাগরিক যেমন তার দেশের, তেমনি বিশ্বসমাজেরও একজন সদস্য। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

www.pathagar.com

হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা।

মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে আর্থ সামাজিক এবং মানসম্পন্ন জীবন যাপনের পূর্ব শর্ত।

মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো ঃ

১। শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যেক স্তরের পূর্ববর্তী স্তরের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা এবং এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা।

২। নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৩। ধর্মীয় ও নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুপ্রাণিত করা।

৪। দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করা।

৫। শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সমর্থ না করা।

৭। জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

৮। প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট স্তরের পরবর্তী স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি হাসিলে সাহায্য করা।

প্রধান উদ্দেশ্য

১। এ স্তরের শিক্ষাক্রমকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, বিশেষ করে এ অঞ্চলের দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার সমমান সম্পন্ন করা।

২। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এমন ভাবে শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা যাতে শিক্ষার্থী আত্মকর্মসংস্থান ও উপার্জন সক্ষম হয়।

৩। প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞানকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।

৪। আদর্শ নাগরিক জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন করা।

৫। শিক্ষার্থীদিগকে উন্নত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করা।

৬। ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী বিকাশ সাধন।

৭। শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

৮। ছাত্রদের মেধা ও প্রবণতা অনুসারে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৯। ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন এবং ভবিষ্যত জীবনের উপযোগী করে প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ প্রদান করা।

১০। শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, মেধা, শক্তি, আগ্রহ অভিরুচী প্রভৃতি অনুযায়ী তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সাহায্য করা।

১১। প্রয়োজনীয় সামাজিক আচার-আচরণ ও দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

১২। তত্ত্ব বা জ্ঞান শিক্ষাদানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে তার কর্ম জগতের সাথে পরিচিত করা এবং সে সম্পর্কিত প্রাথমিক দক্ষতা শিক্ষাদান করা।

১৩। শিক্ষার্থীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, মূল্যবোধ প্রভৃতি গড়ে উঠতে সাহায্য করা এবং তার শারীরিক, মানসিক গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে সহায়তা করা।

১৪। শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করা, গণতান্ত্রিক আদর্শে তাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলা।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের কাঠামো

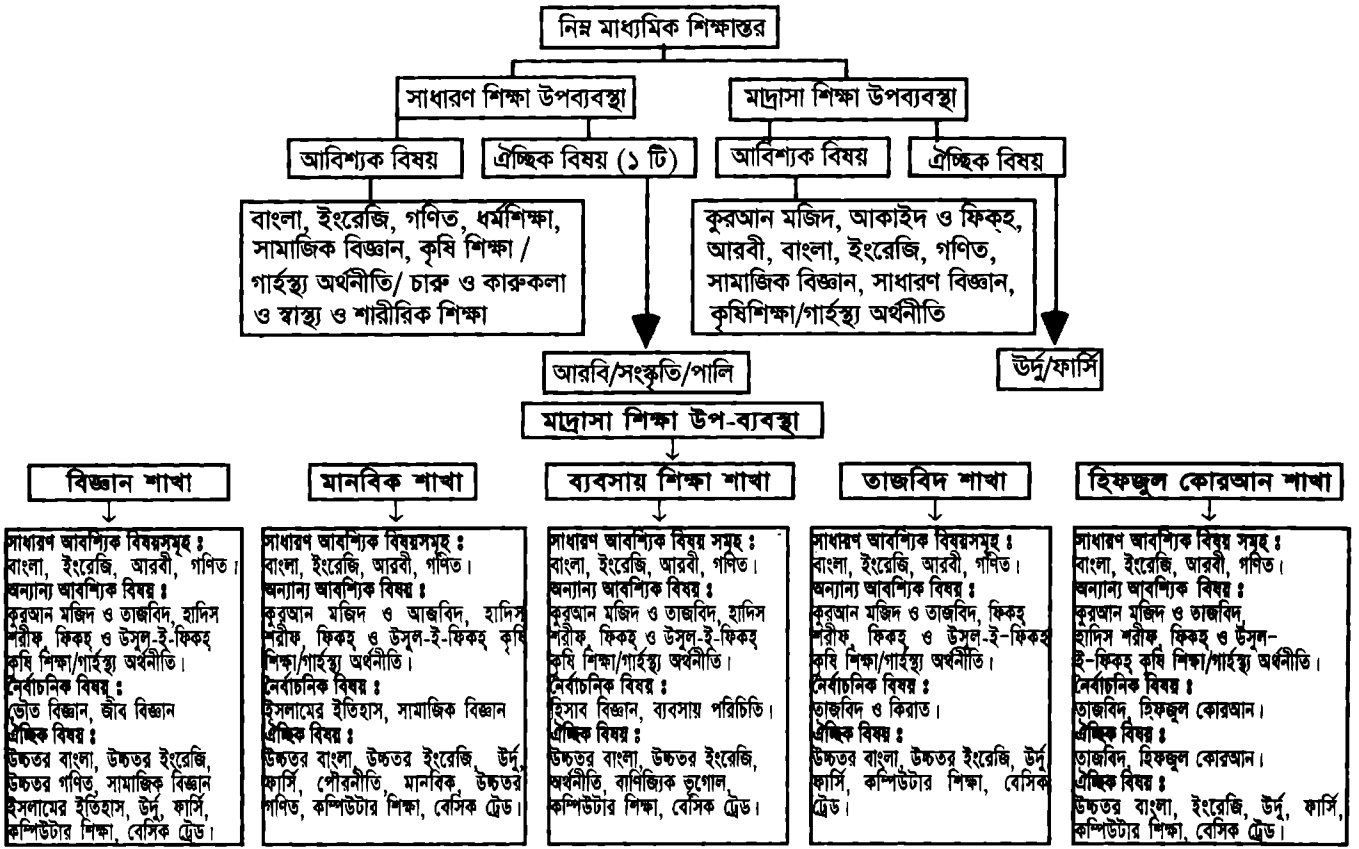

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান মানবীয় সম্পর্ক হলো ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্থান ছিল গৌণ আর শিক্ষক ছিলেন মুখ্য। শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষকের ইচ্ছামত পরিচালিত হতো সেখানে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা প্রবণতা। আগ্রহ ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম ছিল না। আধুনিক কালের শিক্ষাব্যবস্থার এর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মূল কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ছাত্র এবং তাকে ঘিরে সবকিছুর আয়োজন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ আবদুল হাকিম বলেন।

"আজকাল শিক্ষানীতিতে শিশুর মনের খবর নেওয়ার জন্য খুবই বেশি তাড়া দেখা যায়। যাদেরকে শিক্ষা দেয়া হবে তাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মিক শক্তি সামর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অত্যাবশ্যকতা আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সবাই স্বীকার করেন। শিশুরা মানুষের সন্তান কিন্তু শিশুকে একটি ক্ষুদ্রাকার মানুষ হিসেবে দেখে বয়স্কদের মনের মত করে তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা চলে না। কারণ শিশুর দেহ মনের চাহিদা হুবহু বয়স্কদের চাহিদার অনুরূপ নয়। শিশুর যে বয়সে যে দিকে মতি গতি, ঝোঁক বা গরজ সে বয়সে তার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ঐ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখতে হবে। তা না হলে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।"

শিশুকে সুশিক্ষার মাধ্যমে পরিণত ও উপযুক্ত মানব সম্পদে রূপান্তরিত করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই কাজে সাফল্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অধিক। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত মনের দ্বারে কোমল অনুভূতির পরশে তার সে ঘুমিয়ে থাকা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলবেন। এই প্রসঙ্গে প্রফেসর ফাতেমা খাতুন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর প্রতি প্রকৃত মমতাবোধের দ্বারা তার জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া। সে আলোতে উদ্ভাসিত শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের প্রতি অব্যশ্যই অনুরক্ত হবে।

শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের আচরণ হবে সর্বদা সহজ আন্তরিক, সহানুভূতিশীল। ফ্রোয়েবলের মতে, শিক্ষক শিশুর সদাশয় তত্ত্বারধায়ক। শিক্ষকের মধুর ব্যক্তিত্বই তাঁকে করে তোলে শ্রদ্ধা সমীহার পাত্র।

শিক্ষক পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও দক্ষতার সাথে শ্রেণীতে পাঠদান করবেন যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাষায়। শিক্ষার্থীর প্রশ্নের জবাবে কোন রকম

www.pathagar.com

বিরক্তিবোধ না করে বরং প্রশ্ন আহ্বান করে তার উত্তর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। শ্রী মঞ্জশ্রী চৌধুরী তাঁর 'সু শিক্ষক' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

শুধু শ্রেণী কক্ষে নয়। শ্রেণী কক্ষের বাইরে ও শিক্ষক হবেন শিশুর উৎসাহদাতা। নিরাপত্তার আধার। প্রতিটি ছাত্রের গুণাবলীর স্বীকৃতিদান তাকেই করতে হবে। ছাত্রের সৎ গুণের বিকাশ সাধন। দুর্বলতা বা দুশ্চিন্তার অপনোদন করা শিক্ষকের পবিত্র কর্তব্য। শিক্ষার্থীর নানাবিধ সমস্যার মোকাবেলায় শিক্ষক সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন শাস্তি তিনি অবশ্যই দেবেন না।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক জোরদার করতে হলে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের সব সময় বন্ধু ভাবাপন্ন হতে হবে। শিক্ষক যদি ছাত্রের কাজের এবং কথার যথাযোগ্য গুরুত্ব দান করে তাহলে উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শিক্ষক সর্বদাই সুশৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকবেন। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হল সর্বোত্তম মডেল। শিক্ষকের শৃঙ্খলামূলক আচরণ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠতে পারে।

শিক্ষককে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সুরুচি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচরণের পরিচ্ছন্নতা এবং নানারকম মুদ্রাদোষ বর্জিত মধুর বাচনভঙ্গী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পরিহাস প্রিয়, ভাড়ামীপনা শিক্ষকের কাম্য হতে পারে না।

বিদ্যালয়ের সব ধরনের শিক্ষার্থীই থাকে। শিক্ষক তাদের মধ্যে দুর্বল ও মেধাবী বা কৃতি শিক্ষার্থীদের প্রতি স্বতন্ত্র নজর দেবেন। অন্যান্য শিক্ষকসহ অভিভাবকের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ সহায়তা প্রদান করে তাদের নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক অবশ্যই এমন সব গুণাবলির বাস্তব উদাহরণ হবেন যা শিক্ষার্থীদের সুবিবেচনায় একজন শিক্ষকের জন্য বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র বাঞ্ছিত গুণাবলি আয়ত্বকরণের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে এ ধরনের সম্পর্ক একটি পারস্পরিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের থেকে ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থী পরম হিতৈষী, পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারলে তাদের আচরণেও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসবে।

www.pathagar.com

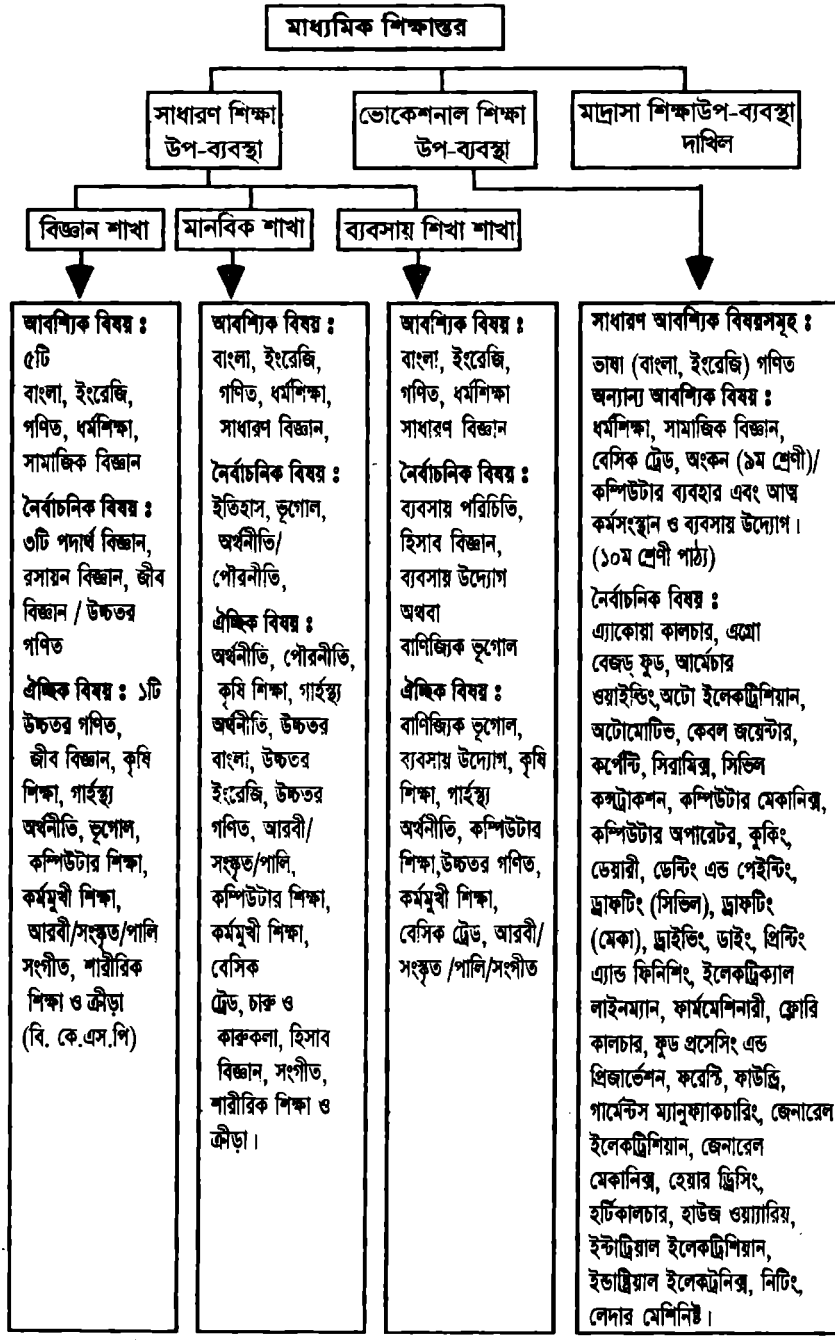

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. সুশিক্ষক — ড: *মঞ্জুশ্রী চৌধুরী*
২. শিক্ষার ভিত্তি — *প্রফেসর একে এম মোজাম্মেল হক*
৩. বৃহত্তর বাংলার ইতিহাস পরিচয় — *ম. ইনামূল হক*
৪. বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা; প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি — *ড. আবদুল ওয়াহীদ*
৫. শিক্ষার ভিত্তি — *ড. মোঃ আজহার আলী ও ড. আবদুল আউয়াল খান*
৬. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা — *হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত*
৭. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস — *এ কে এম আবদুল আলীম*
৮. মাধ্যমিক শিক্ষা — *ফয়জুননেছা ও মনিরুজ্জামান*
৯. শিক্ষানীতি পরিক্রমা — *প্রফেসর মোঃ আনসার আলী*
১০. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা — *ফাতেমা খাতুন*
১১. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী — *ড. মুহাম্মদ আবদুল্লা*
১২. শিক্ষানীতির স্বরূপ — *মোঃ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম*
১৩. পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ জুন, ২০০৪
১৪. স্মরণিকা — গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০০৪
১৫. নবোন্মেষ ঢাকা
মোট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৯৯
১৭. পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ এপ্রিল, ২০০৩
১৮. দর্পণ — দেবিদ্বার রেয়াজ উদ্দীন পাইলট উচ্চা বিদ্যালয় কুমিল্লা, ২০০০
১৯. অগ্রদূত — দেবিদ্বার রেয়াজ উদ্দীন পাইলট উচ্চা বিদ্যালয় কুমিল্লা, ১৯৯৬
২০. সচিত্র বাংলাদেশ জানুয়ারি, ২০০৩
২১. সচিত্র বাংলাদেশ জানুয়ারি, ২০০৪
২২. আমার বাংলাদেশ আমার ভাবনা — *অধ্যাপক আলমগীর কবির*

www.pathagar.com

ISBN 984-8593-02-0

www.pathagar.com